Peace কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

দু'আ কবুলের শর্ত

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
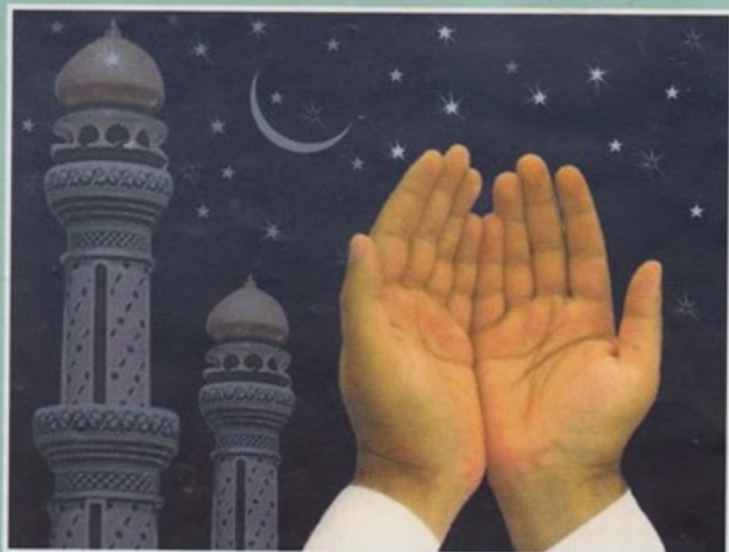
কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে

দু'আ কবুলের শর্ত

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক
বি. এ. অনার্স, এ্যারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
সৌদি আরব

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে

দোয়া কবুলের শর্ত

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন্স

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

ঢাকা – ১১০০

ফোন : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫

প্রকাশকাল

সংস্করণ : এপ্রিল- ২০১২ইং

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984–70256–50

মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা।

সূচীপত্র

লেখকের আরয

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর। অতঃপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরবৃন্দ এবং পরিবার-পরিজনের ওপর।

প্রতিটি মানুষ নিজ পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পেতে চায়। কেউ চায় না যে তার কাজ নিষ্ফল হোক। দুনিয়ার কাজে অধিকাংশ মানুষ কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে যাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাজ নিষ্ফল না হয়। এরই ভিত্তিতে মানুষ কলসিতে পানি ভরার পূর্বে ছিদ্র বন্ধ করে দেয় যাতে তার শ্রম সার্থক হয়। কেউ যদি ছিদ্র কলসিতে পানি ভরতে থাকে তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না; বরং মানুষ তাকে বিবেকহীন বলে আখ্যায়িত করবে; কিন্তু কত মানুষের আমল পানির ন্যায় ছিদ্র পথে বেরিয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হচ্ছে তার হিসাব ক'জনে রাখে?

আমি কেবল আমল নষ্ট হওয়ার ছিদ্রপথ থেকে সতর্ক এবং তা ফলপ্রসূ হওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠক-পাঠিকার হাতে এ পুস্তিকা উপহার দিলাম। আল্লাহ যেন এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন এবং এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আখেরাতের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
বি.এ. অনার্স, এ্যারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
সৌদি আরব।

প্রকাশকের কথা

'দু'আ ইবাদতের মগজ।' ইবাদতের মধ্যে বক্তব্য জাতীয় যা আছে তার অধিকাংশই দু'আ জাতীয়। সে দু'আ মহান আল্লাহ অথবা মহানবী ﷺ কর্তৃক শিখানো। সুতরাং সে দু'আ কবুল হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও দু'আ কবুলের কিছু শর্ত রয়েছে। যা পাওয়া না গেলে দু'আ কবুলের আশা করা যায় না।

এ বইটিতে দু'আ কবুলের সে বিষয়গুলো প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। সে ভিত্তিতে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা হলে সে দু'আ মহানবী ﷺ ঘোষিত তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুলের আশা করা যায়। যথা– ১. তাৎক্ষণিক কবুল, ২. বালা-মুসিবত না আসা এবং, ৩. কিয়ামতে প্রাপ্তি। বইটি পাঠান্তে পাঠক দু'আ কবুলের সঠিক পথ পাবেন বলে আমরা আশা করি।

কৃতজ্ঞতাসহ বইখানার লেখক 'মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক' ও সৌদি আরবের খ্যাতনামা প্রকাশক আব্দুল মালেক মুজাহিদ-এর জান্নাত কামনা করি।

পরিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা বইটি পাঠ করে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে এবং আমরা ধন্য হবো। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

তারিখ : জানুয়ারী ২০১২

প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ
তাওহীদ

আমল কবুলের প্রথম শর্ত ইখলাস বা তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহকে তাঁর প্রভুত্বে, ইবাদতে এবং নাম ও গুণাবলিতে একক জানা। এছাড়া তাওহীদ ও তার বিপরীত শিরক প্রসঙ্গে উত্তমরূপে অবহিত হতে হবে। তবেই তাওহীদযুক্ত ও শিরকমুক্ত আমল সম্ভব। আগে জানা পরে মানা।

মহান আল্লাহ বলেন−

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অর্থ : তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (সূরা মুহাম্মদ : ১৯)

ইমাম বুখারী (র) এ আয়াতের আলোকে বলেন−

اَلْعِلْمُ قَبْلَ الْعَمَلِ ـ

অর্থ : কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা সচেতন যে, কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর আর কোন খাদ্য অপুষ্টিকর। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে থাকি এবং আল্লাহর কৃপায় স্বাস্থ্যবান হই। অনুরূপ আমলের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আমল কবুলের শর্ত কী তা জানতে হবে। কোন পদ্ধতিতে আমল করলে গৃহীত হবে তা জেনে শুনে আমল করতে হবে। নচেৎ ঐরূপ নিষ্ফল হবে যেমন পাথুরে ভূমিতে বীজ বপনকারী কৃষক নিষ্ফল হয়। তাওহীদ সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তা না হলে মানুষ শিরকে পতিত হবে, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের চেয়েও ক্ষতিকারক।

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর পরিত্রাণ যেমন অসম্ভব, অনুরূপ শিরক মিশ্রিত আমল তথা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও অসম্ভব। কারণ শিরক হচ্ছে আমলের ক্যান্সার। কথায় বলে, 'ক্যান্সার নো এন্সার'। যে দেহে ক্যান্সার আছে সে দেহে যেমন কোন ঔষুধ ক্রিয়া করে না ও ধ্বংস অবধারিত। তেমনি যে ইবাদতে শিরক আছে সে ইবাদত কোন কাজে আসবে না ধ্বংস

সুনিশ্চিত। এজন্য তাওহীদের জ্ঞান লাভ করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। এটি আমল কবুলের প্রথম শর্ত যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ

তাওহীদ আরবি শব্দ, এর অর্থ একত্রীকরণ বা একত্ব। আরবিতে বলা হয় تَوْحِيْدُ الْاُمَّةِ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংহতি। শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহকে তিনভাবে একক ও অদ্বিতীয় জানা এবং মানার নাম তাওহীদ। যেমন : ১. তাওহীদুর রুবুবীয়্যাহ, ২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এবং ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত।

তাওহীদুর রবুবীয়্যাহ

(প্রভুত্বের তাওহীদ)

একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন-মৃত্যু দানকারী, বিশ্ব প্রতিপালক ও ব্যবস্থাপক ইত্যাদির প্রত্যয় স্থাপন করা। আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ : (হে নবী) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান-জমিন থেকে রিজিক দান করেন? কে চক্ষু-কর্ণের মালিক? কে জীবিতকে মৃত হতে এবং মৃতকে জীবিত হতে সৃষ্টি করেন এবং কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১)

আল্লাহ এ আয়াতে আকাশ ও মাটি থেকে রিজিকের ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন ও মাটির বুক চিরে বীজ গজিয়ে চারা গাছ বের করেন। আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ـ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ মাটির কোল চিরে বীজ গজিয়ে ও দানা ফুটিয়ে চারা গাছ অঙ্কুরিত করেন। (সূরা আন'আম : ৯৫)

শুধু তাই নয় একই পানির সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূল ও শস্য উৎপাদন করেন। তিনি বলেন–

يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

অর্থ : এগুলোতে একই পানি সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চেয়ে উৎকৃষ্ট করে দেই। এর মধ্যে নির্দশন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা রাদ, আয়াত ৪)

আল্লাহর ঘোষণা–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعٰمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ.

অর্থ : তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে রয়েছে উপদেশ। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে বিশুদ দুগ্ধ, যা উহার গোবর ও রক্তের মধ্য হতে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা নাহল, আয়াত ৬৬)

আল্লাহ যদি আকাশের পানি বন্ধ করে দেন এবং বীজ ফাটিয়ে গাছ বের না করেন তাহলে কোন শক্তি আছে যে ঐ কাজ সম্পাদন করে? যিনি এ বিশাল দায়িত্ব পালন করছেন– তিনিই তো রব। কানের শ্রবণ ও চোখের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কানের মধ্যে এমন চুম্বক সৃষ্টি করেছেন যা বাইরের শব্দকে গ্রহণ করে। কানে শুনতে না পেলে অনেককে কানের পিঠে যন্ত্র বহন করতে দেখা যায় তাই দিয়ে কি শোনার সে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়? কখনই না। চোখে কম দেখলে নাকের ডগায় চশমা ঝুলাতে হয়; কিন্তু তা দিয়ে সামান্য কিছু কাজ হলেও সঠিক দৃষ্টি ফিরে আসে না। একমাত্র ফিরাতে পারেন তিনি যিনি কান ও চোখের সৃষ্টিকর্তা। আর তিনিই আমাদের রব। বীর্যের দু'ফোঁটা পানি থেকে তিনি সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করেন, আল্লাহ বলেন–

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ.

অর্থ : মানুষের ভেবে দেখা উচিত কী বস্তু থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে। সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটি নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে। (সূরা তারিক, আয়াত ৫-৯)

মাতৃগর্ভে যদি ঐ পানি পর্যায়ক্রমে মানুষে রূপান্তরিত না হয় তাহলে কারোর শক্তি নেই যে ঐ কর্ম সম্পাদন করে। বাস্তবে আমরা অনেক বন্ধ্যা মহিলাকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। কেউ তো তাদের কোলে একটি সন্তান দিয়ে তাদের কোলকে ঠাণ্ডা করতে পারে না? যিনি পারেন তিনিই তো আমাদের রব। সে মহান রব সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন এবং নক্ষত্র-রাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন।

আল্লাহর বাণী–

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ـ

অর্থ : তিনি সাত তবক আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা মুলক, আয়াত ৩)

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ـ لاَ الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে পুরাতন খেজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে চলছে। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৩৮-৪০)

মহান আল্লাহ সূর্যকে পৃথিবী থেকে এমন সূক্ষ্ম ও নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখেছেন যা পৃথিবী বাসীর জন্য উপযোগী। বৈজ্ঞানিকগণের মতে, যদি সূর্যকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে চুল পরিমাণ পৃথিবীর নিকটে করা হত তাহলে তা জাহান্নামে পরিণত হত। আর যদি চুল পরিমাণ দূরে সরিয়ে দেয়া হত তাহলে তা বরফে পরিণত হত। এছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারাকে এমন সূক্ষ্মভাবে সাজিয়েছেন যেগুলো নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে। কারো সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে না। রাতের পরে দিন আসে আর দিনের পরে রাত। যদি এক নাগাড়ে রাত অথবা দিন হত তাহলে কার শক্তি আছে যে তার পরিবর্তন সাধন করে।

মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ ـ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ

عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ

অর্থ : বলুন ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলো দান করতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? বলুন ভেবে দেখ তো আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (সূরা কাসাস, আয়াত ৭১-৭২)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

অর্থ : বলুন তোমরা দেখছ কী, যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ্ করবে পানির স্রোতধারা? (সূরা মুলক, আয়াত ৩০)

এ সমস্ত কাজ সম্পাদিত হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছায়। তিনি বলেন–

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ

অর্থ : তিনি আকাশ থেকে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। অত:পর তা তাঁর কাছে পৌঁছাবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (সূরা সাজদাহ্, আয়াত ৫)

যে সত্তা এ সমস্ত কাজ সম্পাদন করছেন তিনিই আমাদের রব (প্রতিপালক)।

একথা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন–

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ـ

অর্থ : বলুন আসমান জমিনের রব কে? বলুন আল্লাহ। (সূরা রাদ : ১৬)

মোটকথা আকাশ-পৃথিবী ও তার মাঝে যা কিছু আছে সব আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁরই দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবুবীয়্যাহ। এ ব্যাপারে যদি কেউ চুল পরিমাণ সন্দেহ পোষণ করে অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে এ পৃথিবী-আকাশ ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি ও পরিচালনা

বা নিয়ন্ত্রণে কোন পীর, ওলী, ফকির অথবা নবীর হাত বা অংশ আছে, তবে সে এ তাওহীদে বিশ্বাসী নয়। এটি সূফীদের আকিদাহ, এ বিশ্বাস হিন্দুদের বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্য। তারা ধারণা করে যে, রাসূল ﷺ এমন ক্ষমতার অধিকারী যা দ্বারা তিনি বিশ্ব পরিচালনা করেন। নাউযুবিল্লাহ।

يَقُوْلُ اَمْجَدُ عَلِىْ : ... اِنَّ الْعِلْمَ كُلَّهٗ تَحْتَ تَصَرُّفَاتِهٖ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّشَاءُ ....

অর্থ: আমজাদ আলী বলেন, সারা বিশ্ব তাঁর অর্থ রাসূল ﷺ -এর পরিচালনাধীনে, তিনি যা চান এবং যার জন্য চান তাই করেন।

يَقُوْلُ اَحْمَدُ رِضَا خَانْ : يَاغَوْثُ (اَىْ يَاعَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِىْ) وَاِنَّ قُدْرَةَ كُنْ حَاصِلَةٌ لِمُحَمَّدٍ مِّنْ رَبِّهٖ وَمِنْ مُحَمَّدٍ حَاصِلَةٌ لَكَ.

অর্থ : আহমাদ রেযা খান বলেন, হে গাউস (হে আব্দুল কাদের জিলানী) আল্লাহ যখন কিছু করার ইচ্ছে করেন তখন বলেন, 'কুন– হয়ে যা' অত:পর তা তো হয়ে যায়, এ 'কুন' শব্দের জন্য সে বলে, মুহাম্মদ ﷺ নিজে রবের পক্ষ থেকে পেয়েছেন, আর আপনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

এ প্রকার তাওহীদকে ন্যাচারাল (প্রকৃতিবাদী) ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস এ জগৎ আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা আগুনের কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে এ পৃথিবীর সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আমরা তাদেরকে নাস্তিক বলে থাকি; কিন্তু নাস্তিক্যবাদের জীবাণু আমাদের মধ্যে চোরা গলি দিয়ে প্রবেশ করে আমাদের ঈমান খুঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করে দিচ্ছে আমরা তার টেরও পাই না। যেমন : দুর্যোগের সময় আমরা বলে থাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ বিশ্বাস বা উক্তি ইসলামিক নয়; বরং প্রকৃতিবাদীদের। এটি তাওহীদে রুবুবীয়্যাহর পরিপন্থী। কারণ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ, প্রকৃতি নয়।

কেবল এ তাওহীদের বিশ্বাসী হলে পূর্ণ একত্ববাদী হওয়া যায় না। এ তাওহীদকে মক্কার মুশরিকরাও বিশ্বাস করত তবুও তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং মুশরিকই ছিল। আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : 'তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর : কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে : এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।' (সূরা যুখরুফ, আয়াত ৯)

এ আয়াত থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে কেবল তাওহীদ রুবুবীয়্যার ওপর প্রত্যয় স্থাপন করলেই মু'মিন হওয়া যাবে না। যতক্ষণ না তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ওপর প্রত্যয় স্থাপন করবে।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

(উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)

'উলুহিয়্যাহ' (أَلَّهَ) (أَلَهَ) থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ উপাসনা করা। সেই জন্য একে উলুহিয়্যাহ বলা হয়। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর পারিভাষিক অর্থ : সর্ব প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইবাদতের অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য না করা। অর্থাৎ যাবতীয় ইবাদতের অধিকারী কেবল তিনিই। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ জ্বিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ـ

অর্থ : আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

পৃথিবীর বুকে কেবল আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হোক, এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আমার ইবাদত কর এবং তাগুতের (অংশীবাদীর) ইবাদত বর্জন কর। (সূরা নাহল : ৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ـ

অর্থ : (হে নবী) আপনি বলুন, আমি আমার রবকে ডাকি তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীদার স্থাপন করি না। (সূরা জ্বিন : ২০)

তিনি আরো বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ أَنَّهٗ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ

অর্থ : হে নবী আপনার পূর্বে যত নবী প্রেরণ করেছি তাদের সকলকে এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে আমি (আল্লাহ্) ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া : ২৫)

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর হক বা অধিকার। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা সব বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। যারা শিরকমুক্ত ইবাদত করে, সে মুআহহিদ (একত্ববাদী) বান্দাকে আযাব না দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهٗ : عُفَيْرٌ، فَقَالَ : يَامُعَاذُ ! وَهَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ، قَالَ : فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَيُعَذِّبَ مَنْ لاَيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ : لاَتُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا ـ

অর্থ : মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাধার পিঠে রাসূল ﷺ-এর পিছনে বসেছিলাম, গাধাটির নাম ছিল উফাইর। ইত্যবসরে তিনি আমাকে বলেন : 'হে মু'আয তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক?' আর আল্লাহর ওপর বান্দার কী হক? তিনি বলেন, আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন না করা বান্দার ওপর আল্লাহর হক এবং যে বান্দা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না তাকে আযাব না দেয়া আল্লাহর ওপর বান্দার হক। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিয়ে দিব না? তিনি বললেন, সুসংবাদ দিও না। দিলে তারা তার ওপর ভরসা করবে (কাজ করবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ বলেন–

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰلِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

অর্থ : (হে নবী) আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদেশ (অহী) আসে। তোমাদের উপাস্য একক অদ্বিতীয়, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে আর কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহাফ : ১১০)

ইবনে কাইয়্যেম বলেন : যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য করা ওয়াজিব। যেমন : সিজদাহ, ভরসা, তাওবা, তাকওয়া, ভয়, নযর, হলফ, দু'আ, তাওয়াফ, প্রভৃতি আল্লাহর অধিকার এবং তার জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত ফেরেশতা, প্রেরিত নবীর জন্যেও তা বৈধ নয়। (নাওয়াকেযুল ঈমান : ১৩২/ড. আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ) যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না; বরং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং জানা গেল যে, তাওহীদ যাবতীয় ইবাদত গৃহীত হওয়ার মৌলিক শর্তের একটি।

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত

(আল্লাহর নাম ও গুণে একত্ববাদ)

প্রথমে আলোচিত হয়েছে যে, বুঝার সুবিধার জন্য আলেমগণ তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন– ১. তাওহীদ রবুবীয়্যাহ (প্রতিপালক বিষয়ে একত্ববাদ), ২. তাওহীদ উলুহিয়্যাহ (উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ), ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিষয়ে একত্ববাদ)

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত : আল্লাহ তা'আলা যে গুণ ও গুণবাচক নামের অধিকারী সেগুলোকে ঠিক ঐভাবে বিশ্বাস করা যেভাবে যতটুকু কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সদৃশ, অসঙ্গত ও বাতিল অর্থ, অস্বীকার, ধরণ এবং দৃষ্টান্ত ব্যতীত আল্লাহর নাম ও গুণের ওপর প্রত্যয় স্থাপন করা।

আল্লাহ বলেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থ : কোন জিনিস আল্লাহর সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং শ্রোতা। (সূরা শূরা, আয়াত ১১)

এ প্রকার তাওহীদ খুব সূক্ষ্ম। এতে অনেকে ভুলে পতিত হয়েছে এবং বাতিল ফিরকার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন : মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ আশায়েরা ইত্যাদি।

শিরক

এ পর্যন্ত তাওহীদের কিছু আলোচনা করা হলো। এরপর তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত শিরকের আলোচনা করতে চাই যা তাওহীদের পথের কাঁটা। এ কাঁটাকে তাওহীদের পথ থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাওহীদি বাগানে প্রবেশ সম্ভব নয়। আর ঐ কাঁটা উচ্ছেদ করতে হলে প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে। সে জন্যে শিরকের আলোচনা প্রয়োজন।

* শিরকের শাব্দিক অর্থ : অংশ।

* পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহর সাথে যে কোনভাবে অংশ স্থাপন করা।

* শিরক প্রথমত, দু'প্রকার। যথা : ১. শিরকে আকবার, ২. শিরকে আসগার।

শিরকে আকবার
(বড় শিরক)

যদি কেউ কোন মাখলুককে (সৃষ্টিকে) আল্লাহর সমতুল্য মনে করে ডাকে অথবা কোন প্রকার ইবাদত তার জন্য করে তাহলে সেটি বড় শিরক।

বড় শিরকের প্রকারভেদ

(ক) আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক : খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আর ইয়াহুদিরা উযায়ের আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। আল্লাহ তাদের ধারণার প্রতিবাদ এভাবে করেন–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ـ

অর্থ : ইয়াহুদিরা বলে 'উযাইর' আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, 'মাসীহ' আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। (সূরা তাওবা, আয়াত ৩০)

(খ) ইবাদতে শিরক : আল্লাহ বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেন নেক আমল করে এবং তার ইবাদতে আর কাউকে অংশীদার না করে। (সূরা কাহফ, আয়াত ১১০)

(গ) আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক : আল্লাহ যে গুণের অধিকারী সে গুণে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে, এ কথায় বিশ্বাস করা।

আল্লাহ বলেন–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ۔

অর্থ : গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না। (সূরা আন'আম, আয়াত ৫৯)

(ঘ) মহব্বতের শিরক : তা হল আওলিয়া প্রভৃতিকে এমন ভালবাসা ও ভক্তি করা যেমন আল্লাহকে ভালবাসা ও ভক্তি করা হয়। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার এ বাণী–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ۔

অর্থ : কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাঁর) সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে এমন ভালবাসে যেমন আল্লাহকে ভালবাসা হয়; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর ভালবাসায় সুদৃঢ়। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৫)

(ঙ) আনুগত্যের শিরক : তা হল, বৈধ মনে করে আল্লাহর অবাধ্যতায় উলামা ও পীর-বুযুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেন–

اِتَّخَذُوْآ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

অর্থ : তারা আল্লাহর পরিবর্তে ওদের পণ্ডিত (পাদরী) ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবা, আয়াত ৩১)

(চ) নিয়ন্ত্রণ কর্মের শিরক : এ বিশ্বাস করা যে কতিপয় আওলিয়ার বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে, যাঁরা বিশ্বের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে থাকেন! যাঁদেরকে কুতুব বলা হয়। অথচ আল্লাহ প্রাচীন মুশরিকদেরকে বলে প্রশ্ন করেন–

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ۔

অর্থ : কে সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তারা বলবে, আল্লাহ। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১)

(ছ) ভয়ের শিরক : এ বিশ্বাস রাখা যে, কিছু মৃত অথবা অনুপস্থিত আওলিয়াদেরও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে যা ঐ বিশ্বাসীর মনে ভয় সঞ্চার করে, ফলে তাদেরকে ভয় করে। এ বিশ্বাস ছিল মুশরিকদের। এর প্রতি সতর্ক করে কুরআন বলে–

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ـ

অর্থ : আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়। (সূরা যুমার, আয়াত ৩৬)

এ প্রকার শিরক মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অমুসলিম বানিয়ে দেয়।

শিরকে আসগর

(ছোট শিরক ও তার প্রকারভেদ)

ঐ সমস্ত মাধ্যম বা কর্ম যা শিরকে আকবারের কাছে পৌঁছে দেয় ও ইবাদতের মর্যাদায় না পৌঁছে তা শিরকে আসগর হয়ে যায়। এ ধরনের শিরককারী ইসলাম হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না। তবে তা কবীরা গুনাহ অবশ্যই বটে। যেমন :

(ক) 'রিয়া' (লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) যা সৃষ্টির মন আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইবাদতকে সুশোভিত করা। যেমন এক মুসলিম আল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে ও আল্লাহর জন্য সালাত পড়ে; কিন্তু লোকের সামনে তাদের প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে তার সৎকর্ম ও সালাতকে সুন্দররূপে সুশোভিত করে– এরূপ কাজ ছোট শিরক। আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও কষ্ট দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না, সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্যে অথচ আল্লাহ ও পরকালে সে বিশ্বাস করে না। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

রাসূল ﷺ বলেছেন–

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَيْرَهٗ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ

فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِ اللّٰهُ بِهِ -

অর্থ : সুফিয়ান সালামাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সালামা আরো বলেন যে, (এই বর্ণনার ক্ষেত্রে) জুনদুব ব্যতীত আর কাউকে বলতে শুনিনি যে সে বলেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি জুনদুবের নিকটবর্তী হই অত:পর তাঁকে বলতে শুনি, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যকে শুনাবার জন্য আমল করবে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের মাঠে কথা শুনাবেন। আর যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্য আমল করবে আল্লাহ্ তাকে (কিয়ামতের মাঠে) সবার সামনে তার মুখোশ খুলে দিবেন অর্থাৎ তার গোপন মতলব দেখিয়ে দিবেন। (বুখারী)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْاَصْغَرَ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ : اَلرِّيَاءُ يُقَالُ لِمَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا جَاءَ النَّاسُ بِاَعْمَالِهِمْ : اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فَاطْلُبُوْا ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ -

অর্থ : রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের ওপর সবচেয়ে যে জিনিসের ভয় করছি সেটি হচ্ছে শিরকে আসগর (ছোট শিরক), সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন : রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল, (কিয়ামতের দিন) মানুষ যখন নিজ আমল নিয়ে আসবে তখন রিয়াকারদের বলা হবে তোমরা তাদের নিকট যাও যাদেরকে দেখিয়ে তোমরা আমল করতে এবং তাদের কাছে সে আমলের প্রতিফল কামনা কর। (তাবারানী, উত্তম সনদ)

(খ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম (শপথ করা) নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে) কসম খায় সেটি শিরকে খাফী (গুপ্ত শিরক) এবং ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যানুযায়ী, কোন ব্যক্তি তার সঙ্গীকে আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে) বলা ছোট শিরক। তদানুরূপ যদি আল্লাহ তারপর অমুক না থাকত (তাহলে এই হত) বলা বৈধ।

রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা এবং অমুক যা চেয়েছে বলো না বরং আল্লাহ তারপর অমুক যা চেয়েছে বল। (সহীহ, মুসনাদে আহমাদ)

প্রচলিত শিরক

বর্তমান আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় মাযার, খানকা এবং দরগা গজিয়ে উঠেছে। এগুলো শিরকের আখড়া। অনেকে উক্ত স্থানসমূহে গরু, ছাগল ও মোরগ-মুরগি মানত করে যবাই করে রোগ থেকে মুক্তি লাভ, রুজি ও ছেলে ইত্যাদি কামনা করে। কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে। সেখানে বাৎসরিক ওরস মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মেলায় অংশগ্রহণকে পুণ্যের কাজ মনে করে। সেজন্য ঐ সময় যানজট হয়। নর-নারীর ঢল নামে। জনগণের ভিড়ে দৃষ্টির আড়ালে অনেক অঘটন ঘটে যায়। সাধারণ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সম্পদ উপার্জন করে সে সম্পদ খাজা বাবার পকেটে প্রবেশ করে। বাজারে গিয়ে মানুষ আলু-পটল কিনতে গিয়ে দর-দাম করে, যেখানে দু'পয়সা কম পায় সেখানে খরিদ করে; কিন্তু খাজা বাবার দরগায় কোন হিসাব নেই, দরদাম নেই যা আছে তাই অথবা কাছে না থাকলে চাঁদা তুলেও দেয়া হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস খাজা বাবা প্রয়োজন ও মনের আশা পূরণকারী। ভক্তরা বলে, ডাকার মত ডাকতে পারলে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা বাবার দরবারে। ঐ সমস্ত মাযারের শিরকি কর্মকাণ্ড দেখে কবি দু:খ করে বলেন :

তাওহীদের হায় এ চির সেবক ভুলিয়া গিয়াছে সে তাকবীর
দুর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় দরগায় গিয়া লুটায় শির।
ওদের যেমন রাম নারায়ণ এদের তেমন মানিক পীর
ওদের চাউল ও কলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।

হায় আফসোস! এ ধরনের মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যে বান্দা সালাতে বলে এ বাক্য অথচ কাজ হয় ভিন্ন—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

অর্থ : 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।'

এ আয়াত পাঠ করে সে কেমন করে মাযারে গিয়ে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করে? আখিরাতের পরিত্রাণের জন্য খাজা বাবার ওপর ভরসা করে?

পীর

বর্তমানে মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোন না কোন পীরের মুরিদ। তাদের বিশ্বাস পীর না ধরলে পরিত্রাণ নেই। সেজন্য মানুষ দলে দলে পীরের মুরিদ

হয়। মুরিদগণ পীরের সবকিছু পূত-পবিত্র মনে করে। পীরের অবশিষ্ট পানীয় বা খাবার বরকতময় জ্ঞান করে, ফলত তা গ্রহণ করার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হয়। পা ও শরীর ধৌত করা ব্যবহৃত পানি তাবাররুক হিসেবে বিতরণ করা হয়। কেউ হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেখে নেয় আবার কেউ ভবিষ্যতে বরকত হাসিল করার আশায় বোতলে ভরে নেয়। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে পীর বাবাকেই ডাকে এবং স্মরণ করে। আবার কেউ পীর বাবার ছবি গলায় ঝুলিয়ে রাখে। পীরকে এমন ভয় করে যে তার অসম্মানকে ধ্বংসের কারণ মনে করে। এ বিশ্বাস পোষণ শিরকে আকবার। এ প্রকার মানুষরা তৎকালীন মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধম। কারণ তারা অন্য সময় আল্লাহকে ভুলে গেলেও বিপদের সময় তাঁকে ডাকত।

আল্লাহ বলেন–

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থ : তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে অত:পর তিনি যখন স্থলে এনে তাদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরিক করে। (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৫)

কিন্তু বর্তমানে পীর ভক্তরা বিপদে পতিত হলে আল্লাহকে না ডেকে ইয়া খাজা বাবা রক্ষা কর বলে আর্তনাদ করে। সুতরাং তারা সে যুগের মুশরিকদের চেয়ে জঘন্য। আল্লাহকে ডাকা, তাঁর কাছে পরিত্রাণ কামনা করা সবই ইবাদত। রাসূল ﷺ বলেছেন–

اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ـ

অর্থ : যখন চাবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছে চাবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী, উত্তম, সহীহ)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর কাছে কোন কিছু চাওয়া, পরিত্রাণ কামনা করা শিরক এবং তাওহীদে ইবাদতের পরিপন্থী।

পীর ভক্তরা ধারণা করে থাকে যে, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের ইবাদত, দু'আ পীরের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পৌছবে। কারণ আমরা পাপীতাপী মানুষ। আমাদের আমল আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌছবে না এবং পীর সাহেবরা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে পার করে দিবেন। সেজন্য তারা পীরের ওপর সমস্ত দায়িত্ব

অর্পণ করে দায়মুক্ত হয়েছে। আর পীর সাহেবরাও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কারোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা ইবাদত করা শিরকে আকবার। আল্লাহ তৎকালীন মুশরিকদের কথা নকল করে বলেন–

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ـ

অর্থ : আমরা তাদের এজন্য ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (সূরা যুমার, আয়াত ৩)

তারা এও বলত– وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থ : এবং তারা বলত এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুস, আয়াত ১৮)

বর্তমান যুগে যারা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী তারাও ঐ কথা বলে যে, আমরা প্রতিমা পূজার মাধ্যমে ভগবানের নৈকট্য লাভ করতে চাই। তাহলে পীর-মুরিদ এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? মূলকথা হল এ আক্বিদা বিধর্মীদের থেকে ধার করা।

পীর বাবারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এ বলে বোকা বানিয়ে রেখেছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশকারী হবেন, কাজে আসবেন! তাদের এই কথা কত দূর সত্য আল্লাহর বাণী পাঠ করলে পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ বলেন–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا ـ

অর্থ : তোমরা ভয় কর সে দিবসকে যে দিবসে কেউ কারোর কাজে আসবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত ৪৮)

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ـ

অর্থ : যে আত্মা (ব্যক্তি) যে কাজ করবে সেটি তারই জন্য, কেউ কারোর বোঝা বহন করবে না। (সূরা আন'আম, আয়াত ১৬৪)

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে তা সে নিজের জন্য করবে। আর যে ব্যক্তি কুকর্ম করবে তা তার ওপর বর্তাবে। আপনার প্রতিপালক বান্দাদের জন্য জালিম নন। (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৪৬)

يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ـ

অর্থ : সেদিন কোন নফস (মানুষ) কোন নফসের (মানুষের) মালিক হবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। (সূরা ইনফিতার : ১৯)

অন্যত্র বলেন–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা আমার কাছে নি:সঙ্গ এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিক তোমাদের পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম, আয়াত ৯৪)

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন যে সে মুহূর্তে কোথায় থাকবে পীর ও কোথায় থাকবে তার মুরিদ! কেউ কারোর সঙ্গে থাকবে না।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ : يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ، لاَ اُغْنِىَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ، لَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ، لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

অর্থ : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ـ

অর্থ : আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে সতর্ক করুন। (সূরা শুআরা, আয়াত ২১৪)

আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন, হে কুরাইশের দল (অথবা এ ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেন) (তোমরা তাওহীদ ও ইবাদতের

ধারায়) নিজেদের আত্মাকে খরিদ কর অর্থাৎ মূল্যায়ন কর। আমি আল্লাহর নিকটে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারব না। হে বনী আবদে মানাফ আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের উপকার করতে পারব না, হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস আমি আল্লাহর নিকট আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু সাফীয়্যাহ আমি আল্লাহর কাছে আপনার কোন কাজে আসব না। হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে চেয়ে নাও আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন কাজে আসব না। (সহীহ বুখারী)

কিয়ামতের দিবসে নবীগণও ভয়ে ভীত হয়ে নাফসী নাফসী করবেন। বিশ্বনবী যদি তাঁর কন্যা ফাতিমার কোন উপকার না করতে পারেন, নবীগণও যদি নাফসী নাফসী করেন!! তাহলে পীরেরা কোন সাহসে সাধারণ মানুষের সুপারিশ বা উপকারের কথা চিন্তা করে? তারা এও বলে থাকে যে দুনিয়ার কোর্টে যেমন সাধারণ মানুষ হাকিম সাহেবের সামনে কথা বলতে সাহস পায় না, উকিলের মাধ্যমে কথা বলে, তেমনি আখেরাতে আল্লাহর কোর্টেও উকিলের প্রয়োজন। পীরেরা হচ্ছে আখেরাতে আল্লাহর কোর্টের উকিল।

আল্লাহর আদেশ ছাড়াই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর কোর্টের উকিল বানিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার কোর্টে ওকালতি করতে হলে কাগজ-পত্র পেশ করতে হয় ও ডিগ্রির প্রয়োজন হয়; কিন্তু তারা আল্লাহর কোর্টে এমনি উকিল হয়েছে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আল্লাহর কোর্ট ও বিচারের সাথে দুনিয়ার কোর্ট ও বিচারের তুলনা কত বড় বেয়াদবী, তাদের হুঁশ করা প্রয়োজন। আল্লাহর বিচারালয় ও দুনিয়ার বিচারালয় কি এক? আল্লাহর সাথে দুনিয়ার বিচারপতির কি কোন তুলনা হয়? কখনো না। দুনিয়ার বিচারপতি সর্বজ্ঞাত নয়। আয়না ছাড়া চেহারা ও পিঠ দেখতে সক্ষম নয়। কেউ মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে ডিক্রি করিয়ে নিলে তারা টেরই পায় না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকলে কারোর মাধ্যম ছাড়া তা জানতে অক্ষম। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তিনি অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞাত, কোথায় কী ঘটছে সবই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে। তার নিকটে কেউ কিছু ব্যক্ত করুক অথবা গোপন করুক তিনি সবই জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ـ

অর্থ : আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪)

সুতরাং পীরের ওকালতির প্রয়োজন নেই। তাদের এও জেনে রাখা দরকার যে স্রষ্টার সাথে কোন সৃষ্টির সদৃশ স্থাপন শিরক যা তাওহীদ বিরোধী বা আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী।

পীরদের ভেল্কিবাজি বা চালাকি

পীররা কেরামতির নামে যাদু ও জ্বীন দ্বারা অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। ফুঁক মেরে শূন্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জিনিস কোথায় আছে খানকায়ে বসে বলে দেয়। আসল কথা হল কোন সময় তারা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি আবার কোন সময় জ্বিন দ্বারা ঐ আজবলীলা প্রদর্শন করে থাকে। আবু তাহের বর্ধমানী (র) তাঁর (পীর তন্ত্রের আজব লীলা) নামক পুস্তকে পীরদের ভেল্কি বা চালাকির কথা উল্লেখ করেছেন; তার দু'একটি নমুনা নিম্নরূপ :

এক পীরের আড্ডায় পীর ও তার ভক্তদেরকে বিকট চিৎকার করে হেলেদুলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করে যিকির করতে দেখে এক হাজী সাহেব বলেছিলেন, তোমরা যিকির করোতো এতো নাচো কেন? সঙ্গে সঙ্গে পীর বাবাজী উত্তর দিলেন, বাবা কেবল হাজী হলেই হয় না, কুরআনের খবর-টবর রাখতে হয়। এ বলে পড়তে শুরু করেন, কুল আউযো বিরব্বিন নাছে, মালেকিন নাছে, ইলাহিন নাছে, মিন শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছে আল্লাযী ইউ ওয়াছ বিছু ফী সুদুরিন নাছে, মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাছে। অর্থাৎ রব নাচে, মালেক নাচে, ইলাহি নাচে, জ্বিন-ইনসান সবাই নাচে, নাচে না কেবল খান্নাস। নাউযুবিল্লাহ।

এক পীরের কাছে কোন লোক গেলেই এক গ্লাস পানি আনতো। তারপর ঐ পানিতে লাঠির মাথাটা একটু ডুবিয়ে বলত, নে বেটা খেয়ে নে। ভক্ত পানি খেয়ে দেখে একেবারে মিসরীর শরবত; কিন্তু পীর যে আগেই কাম সেরে রেখেছে তা আর ক'জনে জানে। লাঠির মাথায় সেগারিন দিয়ে রেখেছে।

এক মুনসেফ সাহেবের একটা ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে মুনসেফ সাহেব জনৈক পীর সাহেবের কাছে গেলেন। দূর থেকে মুনসেফ সাহেবকে দেখে পীরের জনৈক ভক্ত পীরের কানে কানে বলে দিল যে, হুজুর আজ তিন দিন হল মুনসেফ সাহেবের ছেলে হারিয়েছে, তাই আপনার কাছে আসছেন। সামনে যেতেই কোন কথা না শুনেই চোখ বন্ধ করে ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে পীর বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা! মাত্র তিন দিন হল। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, ফল পাবে, ফল পাবে। মুনসেফ শুনেই অবাক, একি! কেমন করে ইনি জানলেন যে, আমি ছেলের জন্য এসেছি এবং আমার ছেলে তিন দিন হল হারিয়েছি? যাক, তিনি আবেদন করে চলে গেলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ছেলেটি কয়েক দিন পর ফিরে এলো। পীরের ভক্ত এ রিপোর্টটাও দিয়ে দিল। ছেলে ফিরে আসায় মুনসেফ সাহেব খুশি হয়ে কিছু উপঢৌকন নিয়ে পীরের কাছে যেতেই সে আগের ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা, বলি নাই যে ধৈর্য ধরো, ফল পাবে। কী হল– ছেলে এসেছে তো? বাবা এসেছে, এসেছে।

মোটকথা আউট বুদ্ধি খাটিয়ে পীররা তাদের ব্যবসাকে ঠিক রেখেছে। আর জনগণ তাদের অন্ধভক্ত হয়ে পা চাটতে শুরু করেছে। অধিকাংশ পীরদের কর্মকাণ্ড শিরক থেকে মুক্ত নয়। তারা ভক্তদের নিকট হতে সেজদাও পেতে চায়।

পীরদের সেজদার দাবি

অনেক পীর বলে থাকেন যে, তা'জিমের (সম্মানের) সেজদা হালাল। সেজন্য তারা মুরিদের কাছ থেকে সেজদা নিয়ে থাকেন। তারা বলেন, ফেরেশতারা যখন আদমকে সেজদা করেছিলেন, তখন মুরিদরা কেন পীরকে সেজদা করবে না? তারা আরও বলে ইবলিস যেমন আদমকে সেজদা না করে শয়তান হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি কোন মুরিদ যদি তার পীরকে সেজদা না করে, সেও শয়তান হয়ে যাবে। এ ফতোয়ার পর কোন অন্ধভক্ত আর ঠিক থাকতে পারে? তাই দেখা যায় দলে দলে সব ভক্তরা এসে পীরের সেজদা করে থাকে। পীর সাহেবও এডিশনাল গড সেজে দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় হাসতে হাসতে সেজদা গ্রহণ করে। পীর মরে গেলেও ছাড়াছাড়ি নেই। ভক্তরা কবরে যেয়ে মাথা ঠুকতে থাকে; কিন্তু এ ভ্রান্তের দল এতটুকু বুঝতে সক্ষম হল না, যে ফেরেশতা আর মানুষ কখনো এক জীব নয়। ফেরেশতারা যা করে মানুষের জন্য তা করণীয় নয়; আর মানুষ যা করে, ফেরেশতাদের জন্য তা করণীয় নয়।

তাছাড়া আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, আদমকে সেজদা কর, তাই তারা সেজদা করেছিল; কিন্তু এ পীর নামধারী জীবগুলোকে কে হুকুম দিয়েছে যে মানুষ হয়ে মানুষকে সেজদা করতে হবে? পীররা কি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত নয়? যদি উম্মত হয় তাহলে শেষ নবী যে শরিয়ত রেখে গেছেন তাই তাদের মানতে হবে। তাঁর আগের কোন বিধি-বিধান মানা যেতে পারে না। রাসূল ﷺ -এর আগে আদম আলাইহিস সালাম-এর যুগে আপন ভাই বোনে বিয়ে হালাল ছিল, অন্য নবীদের যুগে শত সহস্র স্ত্রী হালাল ছিল ও মদ হালাল ছিল। তাই বলে কী এ পীর সাহেবরা আপন বোনকে বিয়ে করবে? মদপান চালু করবে? আসল কথা হল ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সেজদা বৈধ নয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

فَاِنِّىْ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا حَقِّهِمْ عَلَيْهِنَّ.

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি যদি কাউকে কারোর জন্য সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে মহিলাদেরকে নিজ স্বামীর জন্য সেজদা করতে আদেশ দিতাম। কারণ আল্লাহ্ তাদের ওপর স্বামীর অনেক হক নির্ধারণ করেছেন। (বায়হাকী)

মোটকথা পীরদের কর্মকাণ্ড শিরক থেকে মুক্ত নয় যা আমল কবুলের প্রথম শর্ত তাওহীদ বা একত্ববাদের পরিপন্থী।

মাযার

এর পূর্বে পীরের জীবিতাবস্থার কথা বলা হয়েছে। এবার পীর মরে গেলে কী হয় তা দেখা যাক। পীর মরে গেলে তার কেস্সা শেষ হয়ে যায় না; বরং তার মৃত্যুর পর কেরামতি দ্বিগুণ হয়ে যায়। সেজন্য ভক্তরা তার কবর পাকা করে ও পাশে বিল্ডিং নির্মাণ করে, কবরকে চাদর দিয়ে ঢেকে আগর বাতি জ্বালায়। তাওয়াফ ও সিজদা করে। শত শত মানুষ নিজ নিজ মনোবাসনা পূরণের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত হয়। এ সমস্ত কাজের পিছনে মনের মণি কোঠায় লুকিয়ে থাকা একটি শক্তি কাজ করে, সেটি হচ্ছে পীর-ওলী মরে গেলেও ওদের কেরামতি মরে যায় না। কবরের ভেতর থেকে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে এ তাদের বিশ্বাস। হায় আফসোস! মানবজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও বুঝতে পারে না যে, জীবনের অবসান ঘটলে তার কোন শক্তি থাকে না? মানুষ কবরের গর্ভে গভীর পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় অসহায়। মৃত্যুর পর যদি কারো কিছু করার শক্তি থাকত তাহলে রাসূল ﷺ-এর থাকত; কিন্তু না তাঁরও নেই। তাই সাহাবীগণ নবীজির মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উসীলায় পানির জন্য দু'আ করছিলেন, নবীজির কবরের কাছে নয়। বিশ্ব নবী যাঁর অগ্র পশ্চাতের পাপ মার্জিত তাঁর যদি মৃত্যুর পর মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা না থাকে তাহলে আর কার থাকতে পারে?

চিন্তা করুন হে পাঠক! এ আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে মাযারগুলো শিরকের আখড়া। আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী।

পাকা কবর

উপমহাদেশে কবর পাকা করার প্রবণতা খুব বেশি। কারণ ঐ এলাকার অনেক মানুষ মনে করে কবর পাকা করা পুণ্যের কাজ। সে জন্য রাস্তার পাশে, চৌমাথায় ও বটতলায় পাকা কবর নযরে পড়ে। আবার অনেকে স্মৃতির জন্য পাকা করে নাম প্লেট বসায় অথবা পাকা দেয়ালে খোদাই করে নাম, উপাধি ও মৃত্যুর তারিখ লিখে।

(আলহাজ খোদা বখশ তাং ২৫ রমযান) ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজ বিদ'আত এবং শিরকের ঠিকাদার।

রাসূল ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ نَهٰى عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَأَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ ـ

অর্থ : জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ কবর পাকা ও তার ওপর বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ نَهٰى عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ـ

অর্থ : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ কবরসমূহকে পাকা এবং তার ওপর লিখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৬২২৩)

কবরকে কেন্দ্র করে পুণ্যের আশায় মেলা, অনুষ্ঠান এবং যাত্রা করা নিষেধ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ بَلَغَنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত কর না। নিশ্চয় তোমরা যেখান থেকে দরূদ প্রেরণ কর সেখান থেকে আমার কাছে পৌছে যায়। (আবু দাউদ)

لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ

অর্থ : আমার এ মসজিদ, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা, এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত (পুণ্যের আশায়) ভ্রমণ করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে কবর পাকা করা বিদ'আত ও শিরকের পোস্ট অফিস। এর প্রমাণে আল্লাহ বলেন–

وَقَالُوْا لاَتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَيَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ـ

অর্থ : তারা বলত, তোমরা তোমাদের উপাস্যকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে। (সূরা নূহ, আয়াত ২৩)

উল্লিখিত প্রতিমাগুলো আসলে এক একটি সৎ লোকের নাম। তাদের মৃত্যুর পর পরবর্তীরা তাদেরকে প্রতিমায় পরিণত করেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : صَارَتِ الْاَوْثَانُ الَّتِىْ كَانَتْ فِىْ قَوْمِ نُوْحٍ فِى الْعَرَبِ بَعْدُ اَمَّا وَدٌّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَاَمَّا سُوَاعٌ : فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَاَمَّا يَغُوْثُ : فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِىْ غُطَيْفٍ، بِالْجُرُفِ عِنْدَ سَبَاٍ، وَاَمَّا يَعُوْقُ : فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَاَمَّا نَسْرٌ : فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ، لِاٰلِ ذِى الْكِلَاعِ، اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوْا اَوْحَى الشَّيْطَانُ اِلٰى قَوْمِهِمْ اَنْ اَنْصِبُوْا اِلٰى مَجَالِسِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِاَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوْا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتّٰى اِذَا هَلَكَ اُولٰئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ ـ

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আরবের কওমে নূহের কিছু প্রতিমা ছিল যেমন : 'উদ' প্রতিমা ছিল দাওমাতুল জানদালে কালব গোত্রের জন্য, "সু'আ" প্রতিমাটি ছিল হুযায়েল গোত্রের জন্য, আর "ইয়াগুস" প্রতিমাটি ছিল মুরাদ ও বানী গোতাইফের জন্য সাবার নিকটে জুরাফ নামক স্থানে, "ইয়াউক্ব" প্রতিমাটি ছিল হামদান গোত্রের জন্য এবং "নাসর" প্রতিমাটি ছিল হিমইয়ার গোত্রের আলে যিলকেলার জন্য। এগুলো কওমে নূহের সৎ ব্যক্তিদের নামসমূহ। তাঁরা যখন মারা যান তখন শয়তান তাঁদের কওমের (বংশধরের) মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তাঁরা যেন সৎ ব্যক্তিদের বসার স্থানে মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের নামে নামকরণ করে। অত:পর তারা তাই করে। তবে তাদের পূজা করা হয় নি; কিন্তু ঐ বংশধররা যখন গত হয়ে যায় এবং (মূর্তি তৈরির ঘটনা) যখন মানুষ ভুলে যায় তখন মূর্তি পূজা আরম্ভ হয়। (বুখারী)

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, সালাফগণ বলেছেন যে, তারা তাদের মূর্তি তৈরি করার পূর্বে অন্তরে মুহাব্বত রেখে তাদের কবরে বারবার যেত, তারপর তারা

তাদের মূর্তি তৈরি করে। অত:পর যখন অনেক দিন গত হয়ে যায়, তখন ইবাদত শুরু করে। (ফাতহুল মাজিদ পৃ : ১৯২)

রাসূল ﷺ বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজার প্রতিমায় পরিণত কর না। আল্লাহ ঐ কওমের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুআত্তা, হাদীস নং ২৭১)

عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ : اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، اَلاَ فَلاَتَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ ـ

অর্থ : জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর কেবল পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, "সতর্ক হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীগণ ও সৎ ব্যক্তিদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। খবরদার তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করছি। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং জানা গেল যে, কবর পাকা করা বা বাঁধানো শরিয়ত বিরোধী ও বিদ'আত কাজ, যা দ্বারা মানুষ ক্রমশ কবর পূজায় পতিত হয়। সে জন্য সাহাবীগণ ঐ কাজ বন্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এর প্রমাণে একটি ঘটনা আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি, যেটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তার মাগাযী গ্রন্থে ইউনুস ইবনে বাকের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবু খালজা খালিদ ইবনে দিবার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু আলিয়া বলেছেন : যখন আমরা ইরানের শহর 'তুসতার' বিজয় করলাম তখন হুরমুযানের বাইতুল মালে একটি আর্ট দেখতে পেলাম, তার ওপরে রয়েছে একটি লাশ। মাথার পাশে রয়েছে একটি সহীফা। আমরা সহীফাটি নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি

কা'আব রাদিআল্লাহু আনহু-কে ডাকলেন, কাআব রাদিয়াল্লাহু আনহু এটিকে আরবিতে অনুবাদ করলেন।

আরবীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি এটি পাঠ করলাম। এটিকে আমি কুরআনের সুরেই পাঠ করেছিলাম। আমি আবু আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম। সেখানে কী লেখা ছিল? তিনি বললেন : তোমাদের চরিত্র, তোমাদের কর্ম, তোমাদের কথাবার্তা, ভুল-ভ্রান্তি ও ভবিষ্যৎ বাণী। আমি বললাম, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি ছিলেন দানিয়াল আলাইহিস সালাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি কতদিন পূর্বে মারা গেছেন? তিনি বললেন : আনুমানিক তিনশত বছর। আমি বললাম তার শরীরের কোন অংশ কি পরিবর্তন হয় নি? তিনি বললেন, না। তবে চুলের কিছু অংশ বিকৃতি ঘটেছিল।

নিশ্চয় নবীগণের (শরীরের) গোশ্ত মাটি ভক্ষণ করে না। প্রাণীরাও তা খায় না। আমি বললাম, এসব দেহ হতে তারা কী করত? তিনি বললেন, যখন আসমান পানির দরজা বন্ধ করে দিত, তখন তারা এ মৃত দেহকে বাইরে নিয়ে আসত। আমি প্রশ্ন করলাম আপনারা এ মৃত দেহ কী করলেন? তিনি বললেন, আমরা দিনের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তেরটি কবর খনন করলাম। অত:পর রাত্রিতে তাকে একটি কবরে দাফন করলাম যাতে সঠিক কবর কেউ খুঁজে বের করতে না পারে।

তাবীজ

বদ নযর, রোগ ও আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় আমাদের সমাজে কতিপয় মানুষ হাতে, কোমরে, গলায় লোহার অথবা তামার মাদুলি ঝুলাতে দেখা যায়। এ সব কাজ শিরক।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলালো সে শিরক করল। (আহমাদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ـ

অর্থ : ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি (শিরকি বুলি মিশ্রিত) ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যোগ মাদুলি (ঝুলানো) শিরক। (আবু দাউদ ও আহমাদ)

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَن عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. قَالَتْ قُلْتُ : لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا، وَاللّٰهِ ! لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِىْ تَقْذِفُ، فَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى فُلاَنٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِىْ، فَاِذَا رَقَانِىْ سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهٖ فَاِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ اَنْ تَقُوْلِىْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا .

অর্থ : আব্দুল্লাহর স্ত্রী আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল-কে বলতে শুনেছি, শিরক মিশ্রিত কথা, ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যোগ মাদুলি শিরক। তিনি বললেন, আমি বললাম, তুমি এরূপ কথা বলছ কেন? আল্লাহর কসম আমার চোখ কড়-কড় করত যার জন্য আমি জনৈক ইয়াহুদির নিকটে যেতাম সে আমাকে ঝাড়ত, যখন ঝাড়ত তখনি আমার চোখ শান্ত হত। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বলেন, এটি শয়তানের কাজ, সে তার হাত দ্বারা চোখে খোঁচা মারত, যখন ঝাড়তো তখন খোঁচা মারা বন্ধ করত; বরং তোমার জন্য ঐ দু'আ বলা যথেষ্ট যা রাসূল ﷺ বলতেন–

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ، لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا .

অর্থ : হে মানুষের রব, আপনি রোগ দূরিভূত করুন, আরোগ্য প্রদান করুন। আপনি আরোগ্য প্রদানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। আপনার আরোগ্য এমন যা কোন রোগকে বাদ দেয় না। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৮৮৩)

(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী সেটি সমর্থন করেছেন।) এ হাদীসের আলোকে একথা বলা যেতে পারে যে তাল পাতায় বা অন্য কিছুতে লিখে বাচ্চাদের গলায় ঝুলানো, গাভীর গলায় চামড়া ও আমড়ার আঁটি, পাকা ঘর তৈরির সময় ভাঙ্গা ঝুড়ি এবং গাড়ির সামনে জুতা ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ উদ্দেশ্য ঐ বস্তুগুলো আপদ-বিপদ ও বদ নযর থেকে রক্ষাকারী।

তাতাইয়ুর

অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ বিচার করা বা তার ফলাফল গ্রহণ করা শিরক। রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا وَمَا مِنَّا اِلاَّ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ ফল গ্রহণ করা শিরক, বাক্যটি তিনবার বলেছেন। আমাদের মধ্যে যে কেউ ঐ কাজ করবে সে শিরক করবে, তবে ভরসার মাধ্যমে আল্লাহ্ অনিষ্ট দূর করেন।

আজও এ শিরকি প্রথা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। অনেকে বলে ডানের শিয়াল বামে গেল আজকের দিনটা ভাল যাবে না। ঘরের চালে পেঁচা বসলে বলে, কপালে বিপদ আছে। আরো বলে থাকে যে, কার মুখ দেখলাম দিনটা ভাল যাবে না ইত্যাদি। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে পেঁচা, শিয়াল, ভাঙ্গা ঝুড়ি এবং আমড়ার আঁটির মধ্যে ভাল-মন্দ নেই। ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর হাতে। তিনি কারোর মঙ্গল করার ইচ্ছে করলে তা বন্ধ করা এবং কাউকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَهٗٓ اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : যদি আল্লাহ্ কারো ক্ষতি-সাধন করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি কারো কল্যাণ করতে চান (তাহলে তাও করতে পারেন)। কারণ তিনিই তো সব বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আন'আম, আয়াত ১৭)

নক্ষত্র

আকাশের নক্ষত্র দেখে পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটবে, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি হবে তা নির্ধারণ করা। দ্বীন কানা কতিপয় মানুষ নক্ষত্র দেখে বলে এই নক্ষত্রে এ হয় এবং অমুক নক্ষত্রে অমুক হয়। এ সব আক্বিদাহ-বিশ্বাস তাওহীদ বিরোধী বা শিরক।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ نِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى آثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

অর্থ : যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদাইবিয়ার প্রাঙ্গণে আমাদেরকে ফজরের সালাত পড়ান অত:পর সালাত শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বলেন : তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন তা কি তোমরা জান? তারা বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ্ বলেন : "আমার বান্দার মধ্য হতে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে প্রভাত করল আবার কেউ আমাকে অবিশ্বাস করে প্রভাত করল। যে ব্যক্তি বলল : আল্লাহ্র ফযল ও রহমতে আমাদের ওপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং নক্ষত্রের অবিশ্বাসী। আর যারা বলল : অমুক-অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন–

وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصٰبِيْحَ، خَلَقَ هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلَاثٍ : جَعَلَهَا زِيْنَةً لِّلسَّمَاءِ، وَرُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ -

অর্থ : (আমি দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেছি) কাতাদাহ এ আয়াতটি পাঠ করার পর বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা নক্ষত্রকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি

করেছেন। ১. আকাশের সৌন্দর্য, ২. শয়তানের চাবুক, ৩. দিক নির্দেশনার প্রতীক। যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য অর্থ করবে সে ভুল করবে, নিজের ভাগ্য বিনষ্ট করবে এবং অজানা বিষয়ে মাতাব্বরী করা হবে। (বুখারী, হাদীস ৩১৯৮)

কুরআনের বাণী–

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ -

অর্থ : আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা (নক্ষত্র) সুসজ্জিত করেছি। সেগুলোকে শয়তানের জন্য চাবুক বানিয়েছি। (সূরা মুলক, আয়াত ৫)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -

অর্থ : তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ পাও। (সূরা আন'আম : ৯৭)

চন্দ্র ও সূর্য শোভা

চন্দ্র-সূর্যের গায়ে কখনো গোল রেখা পরিলক্ষিত হয়। ঐ রেখা যদি বড় হয় তাহলে বলা হয় নিকটে বৃষ্টি হবে আর ছোট হলে বলা হয় দূরে বৃষ্টি হবে।

ব্যাঙের বিয়ে

বর্ষা নামতে বিলম্ব হলে মানুষ অস্থির হয়ে যায়। বিশ্ব প্রতিপালককে ভুলে গিয়ে বর্ষণের আশায় ব্যাঙের বিবাহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। এ বিয়েতে মোটা অংকের টাকা খরচ করা হয়, অনুষ্ঠান করা হয়, ভোজ খাওয়া হয়। ভোজ খেতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঠেলা-ঠেলিতে আবার অনেকে আহতও হয়। এ ধরনের সংবাদ পশ্চিম বাংলার দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কিছুকিছু এলাকায় পালন করা হয়।

কাঁদা ও গোবর

একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য অনেকে আপষে কাঁদা অথবা গোবর ছিটাছিটি করে। হায় আফসোস! হে মানুষ! তুমি সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর দরবারে হাত না তুলে কাঁদা, গোবর এবং ব্যাঙের বিবাহের মাধ্যমে বৃষ্টি চাও? অথচ আল্লাহ বলেন আমি পানি বর্ষণ করি।

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ -

অর্থ : এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অত:পর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ইলম বা খবর এবং তিনি পানি বর্ষণ করেন। (সূরা লোকমান, ৩৪)

ইসলাম বৃষ্টির জন্য সালাতে ইসতিসকার ব্যবস্থা রেখেছে। রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ (رض) قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِى، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

অর্থ : উবাদাহ ইবনে তামীম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইসতিসকার জন্য বের হন, তারপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেন, নিজ চাদরের দিক পরিবর্তন করেন, তারপর দু'রাক'আত সালাত পড়েন এবং তাতে উচ্চৈ:স্বরে কিরাত পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী)

গণক

বাজারে রাস্তার ধারে, বাস স্ট্যান্ডে ও রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে অনেকে কাগজ বিছিয়ে তামার অথবা সাত ধাতুর আংটি বিক্রি করে। পাশে থাকে হরেক রকমের ঔষুধ ও হাতের নক্শা। খদ্দের জমানোর উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ম্যাজিক দেখায়। লোকে মজা দেখার জন্য তার চারপাশে ভিড় জমায়। তাদের মধ্যেকার ভাগ্যে কী আছে বা ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। গণক বাবু তখন হাতের রেখা গুণে ভবিষ্যতের খবর বলে দিয়ে টনক নড়িয়ে দেয় এবং বলে, তোমার কপালে বিপদ ঘটতে পারে। তবে এ আংটি হাতে রাখলে রেহাই পাবে অথবা বলে তোমার ভাগ্য ভাল তবে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে যদি এ আংটি পরিধান কর। তাদের কথা সবাই বিশ্বাস করতে না চাইলেও তাদের কথার বাঁধুনি ও চটকদার বুলিতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয় না অনেকেই। অবশেষে আংটি ও মাদুলির ওপর ঈমান আনে এবং তার গোলাম হয়ে যায়। এভাবে মুশরিক হয়ে বাড়ি ফিরে।

রাসূলের বাণী–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

অর্থ : আবু হুরায়রা ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গণক অথবা আররাফ এর নিকট এলো ও সে যা বলল তাই বিশ্বাস করলো তাহলে সে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত বস্তুকে অস্বীকার করল। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৯/১১৯, হাদীসটি হাসান, (উত্তম)-এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।)

যাদু

এটিও আমাদের সমাজে পরিচিত ও প্রচলিত; কিন্তু ইসলামে যাদুর কী বিধান তা অনেকেরই জানা নেই। আমাদের জানা প্রয়োজন যে যাদু শিরক এবং কুফরী।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِیْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَیْئًا وُكِّلَ اِلَیْهِ ـ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গিট বেঁধে তাতে ফুঁক দিল সে যাদু করল আর যে ব্যক্তি যাদু করল সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি কোন জিনিস ঝুলালো তাঁরই ওপর নির্ভরশীল হল (সেও শিরক করলো)। (নাসায়ী, হাদীস নং ৪০৮৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ـ

অর্থ : তারা জেনে নিয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা (যাদু) গ্রহণ করেছে আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। (সূরা বাকারা : ১০২)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا یَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ، وَاَكْلُ الرِّبَا ، وَاَكْلُ مَالِ الْیَتِیْمِ، وَالتَّوَلِّیْ یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ ـ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বাঁচ। সাহাবীগণ বললেন, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর অংশী স্থাপন, যাদু, আল্লাহর পক্ষ হতে হারামকৃত আত্মাকে হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ, যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়ন ও সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ। জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু বর্ণনা রয়েছে।

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ـ

অর্থ : যাদুকরের শাস্তি তালোয়ারের দ্বারা মস্তক ছেদন। (তিরমিযী)

দু:খের বিষয় কতিপয় মানুষ এ কাজকে নিজ পেশা বানিয়ে নিয়েছে। অনেক স্থানে যাদু খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ খেলা দেখার জন্য জনগণের ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

হলফ (কসম কাটা)

কসম খাওয়ার শরয়ী নিয়ম হল, উকসিমু বিল্লাহ, ওয়াল্লাহ, বিল্লাহ, তাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কসম খাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছি; কিন্তু মুসলিম সমাজে অনেকের মুখে শিরকী কসম শুনা যায়। যেমন : পশ্চিম দিকে মুখ করে কসম, মসজিদ স্পর্শ করে কসম ও ছেলের মাথা স্পর্শ করে কসম ইত্যাদি। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের কসম করতে পারেন। এটি কুরআনে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু জ্বীন-ইনসান গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) নামে কসম খেতে পারে না, এটি তাদের জন্য বৈধ নয়। গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া কুফরী ও ছোট শিরক।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ ـ

অর্থ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে হলফ (কসম) খেল সে কুফরী অথবা শিরক করল। (তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান (উত্তম) বলেছেন এবং ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন।)

নযর-নেওয়ায

নযর মানা ওয়াজিব নয়। তবে কেউ যদি বলে আমার এ উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমি রোযা রাখব অথবা এত টাকা দান করব ইত্যাদি। তার ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হলে তার ওপর নযর ওয়াজিব হয়ে যাবে। নযর দু'প্রকার : ১. আল্লাহর জন্য নযর মানা, ২. গায়রুল্লাহর জন্য নযর মানা।

১। আল্লাহর জন্য নযর মানা : এটি আবার দু'প্রকার :

(ক) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভাল কাজের নযর মানা। যেমন : কোন ব্যক্তি যদি বলে আমি রোগ মুক্ত হলে আল্লাহর ওয়াস্তে দু'রাক'আত সালাত আদায় করব। বস্তুত সে রোগ মুক্ত হলে তার জন্য ঐ নযর পূরণ করা ওয়াজিব।

(খ) অবৈধ কাজে নযর। যেমন : কেউ যদি বলে আমার মনোবাসনা পূরণ হলে মদ খাব ও গান-বাজনা করব। তাহলে এ নযর মানা বৈধ হবে না। রাসূল ﷺ বলেন—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ -

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের নযর মানবে সে যেন তা পূরণের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যে নযর মানবে সে যেন তা পূরণের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী না করে। (বুখারী)

২। গায়রুল্লাহর জন্য নযর মানা : সাধারণ মানুষ মাযার, খানকা ও দরগাহে গিয়ে বলে, হে খাজা বাবা আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে রোগ মুক্ত করেন তাহলে তোমার জন্য খাসি, মোরগ, টাকা-পয়সা ও আগর বাতি দিব। এ প্রকার নযর শিরক। কারণ নযর আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। আর এ ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়, এ রকম জঘন্য কর্মে মানুষ এখনও লিপ্ত। আরব দেশের মধ্যে মিসরে আল-বাদাবীর মাযার প্রসিদ্ধ।

শাইখ ইবনে বায (র) তার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আহমাদ আল-বাদবী তানতবীর কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কথা শোনা যায়। তবে প্রসিদ্ধ মত হল যে, আল মুলাসমীন শাসকদের তিনি গুপ্তচর ছিলেন। ধোঁকা ও চক্রান্তে পারদর্শী ছিলেন। মিসরে তার কবর জাহেলী যামানায় হোবল-লাতের ন্যায় বড় প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। সেখানে বড় শিরকি কাজ সংঘটিত হয়। নযর নেওয়ায মানা হয়। কৃষকরা তাদের শস্য ও পালিত পশুর অর্ধেক অথবা চতুর্থাংশ তার নামে বরাদ্দ করে। এমন কি পিতা তার কন্যার বিবাহের মোহরের টাকার অর্ধাংশ মাযারের দান বাক্সে রেখে বলে, হে বাদবী এটি তোমার অংশ। এছাড়া প্রতি বছর তিনবার জন্ম দিবস পালিত হয়। মিসরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন লক্ষেরও অধিক মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে সমবেত

হয়। আল্লাহ্ যেন মিসর ও অন্যান্য দেশে ঐ প্রতিমাগুলো অবিলম্বে ধ্বংস করেন এবং জ্বালিয়ে দেন।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণ পেশ করা হল সবই আমাদের সমাজে প্রচলিত। এগুলো শিরক এবং আমল কবুলের প্রথম শর্ত তাওহীদের পরিপন্থী। যারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে আল্লাহ তাদের আমল গ্রহণ করবেন না এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে কখনও ক্ষমা করবেন না; বরং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। নবীগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন–

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থ: হে নবী! আপনি যদি শিরক করতেন তাহলে নিশ্চয় আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যেত এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হতেন। (সূরা যুমার, আয়াত ৬৫)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন–

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ: নবীগণ যদি শিরক করতেন তাহলে তাদের আমল পণ্ড হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, আয়াত ৮৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

অর্থ: আল্লাহর সাথে শিরক করলে নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন না তবে শিরক ব্যতীত যাকে ইচ্ছে তাকে ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা : ৪৮)

নবী করীম ﷺ-এর চাচা আবু তালেব তাঁকে লালন-পালন করেছেন। সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। যেখানে পানি পড়েছে সেখানে তিনি ছাতা ধরেছেন। এক কথায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সে জন্য নবীজির মনের আশা যে তাঁর চাচার শিরকের ওপর মৃত্যু না হয়ে তাওহীদের ওপর হোক। আমল করার সময় না পেলেও কেবল তাওহীদী কলেমা বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তিনি আল্লাহর নিকট চাচার জন্য যুক্তি প্রমাণ খাড়া করবেন। অত:পর তাঁর চাচা যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন তখন রাসূল ﷺ তার মাথার নিকট গিয়ে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এরপর কী ঘটল হাদীসের ভাষায় শোনা যাক-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ نِ الْوَفَاةُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهٗ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ

أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَىْ عَمِّ، قُلْ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ، فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ : يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ، فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ -

অর্থ : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আবু তালেবের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন রাসূল ﷺ তার নিকট আসেন। সে সময় তার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াহ এবং আবু জাহল উপস্থিত ছিলেন। অত:পর রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে চাচা আপনি লা-ইলাহা কালেমা পাঠ করুন। আমি আপনার জন্য কিয়ামতের মাঠে ঐ কালেমার দ্বারা আল্লাহর কাছে দলিল কায়েম করব। তারা দু'জনে বলল : আপনি কি (শেষ মুহূর্তে) আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন? অত:পর রাসূল ﷺ উক্ত কথা পুনরাবৃত্তি করেন। তারাও তাদের কথা পুনরাবৃত্তি করে। শেষ পর্যন্ত তিনি কলেমা লা-ইলাহা-ইলাল্লাহ বলতে অস্বীকার করেন এবং আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর নবী করীম ﷺ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমাকে নিষেধ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য (আল্লাহর নিকট) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।

অত:পর আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى -

অর্থ : নবী ও মু'মিনদের জন্য বৈধ নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয়। (সূরা তাওবা, আয়াত ১১৩)

আর বিশেষ করে আবু তালেবের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ -

অর্থ : (হে রাসূল) আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে আপনি হেদায়াত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন। (সূরা কাসাস : ৫৬)

এ ছিল তাঁর চাচার কথা। তাঁর মায়ের কথায় আসি। মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক। নবী করীম ﷺ তাঁর মায়ের সন্তান, আঁতের টান তো থাকবেই, তাই তিনি আল্লাহর কাছে মায়ের ক্ষমার জন্য দরখাস্ত করেন; কিন্তু আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নি।

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيْبٌ مِّنْ اَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ اِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَدَاهُ بِالْاَبِ وَالْاُمِّ، وَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ؟ قَالَ : اِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اِسْتِغْفَارٍ لِاُمِّىْ فَلَمْ يَاْذَنْ لِىْ فَدَمَعَتْ عَيْنَاىَ رَحْمَةً لَّهَا مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ : ইবনে বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম (রাস্তায় কোন এক স্থানে) আমরা অবতরণ করি। আমরা প্রায় এক হাজার যাত্রী ছিলাম। অত:পর রাসূল ﷺ দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন এবং আমাদের দিকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, পিতা-মাতা কুরবান হোক হে রাসূলুল্লাহ! আপনার কি হয়েছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রবের নিকট মায়ের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুমতি চাইলাম; কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। মায়ের প্রতি করুণা ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করে আমার চোখে অশ্রু নির্গত হয়। (আহমাদ : ৫/৩৫৫)

নবী করীম ﷺ-কে ঘিরে শিরক

অনেকে বিশ্বাস করে রাসূল ﷺ আল্লাহর নূরের তৈরি এবং রাসূলের নূর থেকে সারা জগৎ তৈরি। তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি গায়েবের খবর জানতেন ইত্যাদি। এ ধরনের বিশ্বাস শিরক। কারণ রাসূল ﷺ যদি আল্লাহর নূর থেকে তৈরি হয়ে থাকেন তবে এটি তাঁর সত্তার সাথে শিরক হবে। আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থ : তারা আল্লাহর বান্দার মধ্য হতে কতিপয় বান্দাকে আল্লাহর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। নি:সন্দেহে এরূপ মানুষ প্রকাশ্য কাফের। (সূরা যুখরুফ : ১৫)

সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর জন্য শিরক সম্পর্কে একটি উদাহরণ খুব যুক্তি সংগত মনে করায় পেশ করছি; আল্লাহ সর্বপ্রকার পাপকে ক্ষমা করবেন; কিন্তু শিরকের পাপকে ক্ষমা করবেন না কেন? মানুষের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে ক্ষমা করে না। তেমনি আল্লাহর আসনে কাউকে আসীন করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। কারোর স্ত্রী ছোটখাটো অপরাধ যেমন : টাকা-পয়সা ও জিনিস-পত্র নষ্ট করলে সাময়িক রাগ হলেও পরে ক্ষমা করে দেয়; কিন্তু স্বামীর আসনে অন্য কাউকে অধিষ্ঠিত করলে স্বামী কি তাকে ক্ষমা করবে? কখনও না। অনুরূপ মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিবেন; কিন্তু আল্লাহর আসনে কাউকে অধিষ্ঠিত করলে তিনি তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

অর্থ : আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনো ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, আয়াত ৪৮)

এ পর্যন্ত আলোচনা করে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমল কবুলের ও পরিত্রাণের ক্ষেত্রে তাওহীদুল উলুহীয়্যার (শিরকমুক্ত আমলের) গুরুত্ব কতটুকু?

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে সমস্ত ইবাদত সুন্নাত মুতাবিক হওয়া জরুরি। অর্থাৎ সর্বপ্রকার আমল মুহাম্মদী তরীকায় হওয়া আবশ্যক। নবী করীম ﷺ এর পথ ব্যতীত অন্য কারোর পথে কোন আমল আল্লাহর নিকটে গৃহীত হবে না। সেটি কোন পীরের হউক অথবা ফকিরের হউক অথবা ইমামের হউক। আমাদের কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمٰلَكُمْ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের আমল বিনষ্ট কর না। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৯)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন–

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থ : তোমরা গ্রহণ কর ঐ জিনিস যা রাসূল তোমাদেরকে দিয়েছেন এবং বর্জন কর ঐ জিনিস যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (সূরা হাশর : ৭)

রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ ـ

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দ্বীনে এমন কিছু আমদানি করল যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী : ২৬৯৭)

সুতরাং রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পথে কর্ম সম্পাদন করা আমল কবুলের দ্বিতীয় শর্ত। এ কাজকে সুন্নতী কাজ বলে এবং যে কাজ সুন্নাতের বহির্ভূত তাকে বিদ'আত বলা হয়। শুধু ইবাদত কেন? যেকোন ব্যাপারে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা হলে তার পরিণাম ভয়াবহ। আল্লাহ্ বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তাদের সতর্ক থাকা উচিত যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অথবা ফিৎনা গ্রাস করবে। (সূরা নূর : ৩৬)

এজন্য সাহাবীগণ রাসূলের আদর্শ নিজেদের জীবনে বিনা দ্বিধা ও সংকোচে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। যেমন–

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَاىَ ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهٗ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوْا : رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَانِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا ، اَوْ قَالَ اَذًى، وَقَالَ : اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا .

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, কোন এক সময়ে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের সালাত পড়াচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাঁর জুতো খুলে তাঁর বাম পার্শ্বে রেখে দেন, সাহাবীরা যখন তা প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁরাও তাঁদের জুতো খুলে ফেলেন। রাসূল ﷺ সালাত শেষ করে তাদেরকে বললেন, কোন বস্তু তোমাদেরকে জুতো খুলতে উদ্বুদ্ধ করল? তখন তারা বললেন, আপনাকে আপনার জুতো খুলতে দেখে আমরা আমাদের জুতো খুলে নিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন : জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে আপনার জুতোয় অপবিত্র লেগে আছে (তাই আমি জুতো খুলেছি), অত:পর তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে আসবে তখন ভাল করে দেখে নিবে জুতোয় কিছু লেগে আছে কীনা? যদি কেউ তার জুতোয় অপবিত্র প্রত্যক্ষ করে তাহলে তা পরিষ্কার করে সালাত পড়বে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৫০)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْقِبْلَةِ .

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ যখন কুবায় ফজরের সালাতে ছিল তখন তাদের নিকট কোন ব্যক্তি এসে বলল: আজ রাতে কা'বাকে কেবলা করে সালাত পড়ার আদেশ রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমরা সে দিকে মুখ ফিরাও। তাদের মুখ ছিল শামের (বায়তুল মাকদিসের) দিকে। অত:পর তারা কা'বার দিকে ফিরে যায়। (বুখারী, হাদীস নং ১৪)

উক্ত হাদীসদ্বয়ে রাসূলের জন্য সাহাবাদের চরম আনুগত্য ও অনুকরণের ইঙ্গিত রয়েছে। সাহাবীগণ রাসূলের জুতো খোলার কারণ না জেনেই কেবল আনুগত্যের উদ্দেশ্যে জুতো খুলে নিয়েছেন। সালাতরত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ শ্রবণের পর রাসূলের আনুগত্যে বিলম্ব না করে তাঁরা সে অবস্থায় কিবলা পরিবর্তন করেছেন। এর চেয়ে বড় অনুকরণ কী হতে পারে?

বিদ'আত কাজ আমরা যতই নেকীর আশায় করি সে গুড়ে বালি। অর্থাৎ কোন কাজে আসবে না। কারণ এগুলো সুন্নাত বহির্ভূত। অধিকাংশ মানুষ করছে এ দলিল কোন কাজে আসবে না। কারো নাম 'সাদেক' তাকে যদি এক'শ জন 'সাহেব' বলে ডাকে তাহলে কখনো সাড়া দিবে না। তার মধ্যে একজন যদি সাদেক বলে ডাকে তাহলে সে তার ডাকে সাড়া দিবে। কারণ সে তাকে সেভাবে ডেকেছে যেভাবে তার নাম রাখা হয়েছে। আমলের ক্ষেত্রেও তাই, একজনও যদি সঠিক পথে আমল করে তাহলে তার আমল গ্রহণযোগ্য হবে। আর একশ জন যদি ভুল পথে আমল করে তবুও তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হবে না যদিও তাদের সংখ্যা অধিক। কারণ তাদের কাজ বিদ'আত যা আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী।

মোটকথা রাসূলের সুন্নাতের মাপকাঠিতে মেপে আমাদের আমল করা ওয়াজিব। আর এ আমলকে সুন্নতী আমল বলা হয় এবং সুন্নাতের বহির্ভূত আমলকে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আত হচ্ছে সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমন বিপরীত আলো আর অন্ধকার। আমাদের আমল বিদ'আতমুক্ত করতে হলে সর্বপ্রথম বিদ'আতকে চিহ্নিত করতে হবে। রোগ নির্ণয় না করা হলে যেমন তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তেমনি বিদ'আতকে চিহ্নিত না করলে অথবা না জানলে তা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। অতএব বিদ'আত সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। যাতে আমাদের আমল সুন্নাত ভিত্তিক হয় যা আমল কবুলের দ্বিতীয় শর্ত।

বিদ'আত

বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ : নতুন বা নব আবিষ্কার। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।

১. দুনিয়াবী কার্যকলাপের নব আবিষ্কার যেমন : আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, কল-কারখানা, যান-বাহন ইত্যাদি। এটি বৈধ। কারণ শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা না

পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়াবী সামগ্রী মূলত বৈধ। কেননা এ আবিষ্কারের পেছনে নেকি অর্জনের কোন নিয়ত থাকে না। সে জন্য কেউ বলে না জাপানি ঘড়ি পরলে দশটি এবং চায়না ঘড়ি পরলে পাঁচ নেকি পাওয়া যায়।

২. দ্বীনের কাজে নব আবিষ্কার অর্থাৎ নেকির উদ্দেশ্যে এমন কিছু কাজ আমদানি করা শরিয়ীতে যার কোন ভিত্তি নেই। এটি অবৈধ। কারণ দ্বীনের কাজসমূহ তাওফীক, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল বা দলিল সাপেক্ষ। রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

অর্থ : যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম)

পারিভাষিক বিদ'আতের প্রকারভেদ : ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে নেকির আশায় দ্বীনের নামে নতুন কিছুর উদ্ভাবনকে পারিভাষিক অর্থে বিদ'আত বলে। এটি কয়েকভাবে বিভক্ত :

১. বিশ্বাসগত বিদ'আত অর্থাৎ নবীজির মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু আকিদা বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যা সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী। এসব রকমারী আকিদাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার জন্ম হয়। যেমন :

শিয়া

শিয়া শব্দের অর্থ জামা'আত এবং সাহায্য-সহযোগিতা, অনুকরণ। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে যে, প্রথম যুগে যারা আলী (রা)-কে খলিফা বলে মানত তারাই শিয়া নামে পরিচিত; কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের মধ্যে অনেক ফিরকার সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে তিনটি ফিরকা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। ১. যাইদীয়্যাহ, ২. ইসমাঈলীয়্যাহ ও ৩. ইসনা আশারীয়্যাহ।

শিয়াদের আকিদাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. হুব্ব আহলুল বায়েত অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর পরিবার ও আলী (রা)-এর ওপর মুহব্বত।

২. তাদের এ ভালবাসা অতিরঞ্জন হয় এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা রাসূলের সাহাবীগণের শানে কটূক্তি পেশ করে এবং কাফের ফতোয়া দেয়।

৩. আলী (রা)-কে ও ইমামগণকে উপাস্য জ্ঞান করে। এ ছাড়া তাদের অন্যান্য আকিদাহ রয়েছে যেমন তাদের ধারণায় কুরআন পরিবর্তিত এবং অসম্পূর্ণ। সে জন্য তাদের কুরআনে সূরাতুল বিলায়াহ নামক একটি সূরা রয়েছে যা আমাদের কুরআনে নেই। তাতে সূরায়ে নাশরাহ-এর একটি আয়াত (وَاِنَّ عَلِيًّا صِهْرُكَ)

(নিশ্চয়ই আলী তোমার জামাই) অতিরিক্ত রয়েছে। ইসনা আশারিয়াহ (দ্বাদশ ইমামবাদীরা) বিশ্বাস করে যে ইমামগণ প্রত্যাদেশ এবং মু'জেযাহ (অলৌকিক) শক্তি দ্বারা সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট। (আল-খুতুতুল আরাবিয়্যাহ, মুহিব্বুদ্দিন আল-খতীব।)

সূফী

এটি একটি বাতিল ফিরকাহ, এদের আকিদা-বিশ্বাস বিকৃত এবং অশুদ্ধ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর অর্থ হলো– আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; কিন্তু তারা অর্থ করে, আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অংশ। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, গরু-ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবই আল্লাহর অংশ (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়া তারা আরো বিশ্বাস করে যে, মানুষ ইবাদত করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, আল্লাহ তার মধ্যে প্রবেশ করে যান। সুফীদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মানসুর হাল্লাজ হক বলতে বলতে আনাল হক বলতে আরম্ভ করেছিল। অর্থাৎ আমিই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

তিজানী

এটিও সূফীদের আরেকটি ফিরকাহ। আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আত্তিজানী এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। সে জন্য এদেরকে তিজানী বলা হয়। এদের বিশ্বাস হচ্ছে যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব) এ অর্থে তাদের প্রসিদ্ধ ছন্দ :

গুরু নামে আছে শুধা, যিনি গুরু তিনিই খোদা

তারা ধারণা করে যে তাদের পীরেরা গায়েব জানে ও জাগ্রতাবস্থায় নবী করীম ﷺ-কে দর্শন করে। তাছাড়া তাদের বিশ্বাস যে আহমাদ তিজানী ও তার অনুসারীরা পাপে লিপ্ত হলেও নবী করীম ﷺ তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

ব্রেলবী

এটি একটি ফিরকার নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খাঁ ব্রেলবী। সে জন্য তার অনুসারীদেরকে ব্রেলবী বলা হয়। এদের আকিদাহ শিরকে ভরপুর। তাদের কতিপয় আকিদাহ নিম্নরূপ।

* তাদের ধারণা নবী করীম ﷺ সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নূরের তৈরি। অদৃশ্যের সংবাদে অবগত।

* নবী করীম ﷺও ওলিগণের পৃথিবী পরিচালনায় হাত বা ভূমিকা আছে।

* কবরে নবীগণের কাছে তাদের স্ত্রীগণকে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁদের সাথে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন।

* সালাত রোযা ত্যাগ করলেও পরিত্রাণ আছে; কিন্তু ওরস; মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত না হলে রেহাই নেই।

অনুরূপ মুতাযিলাহ, মুরজিয়া, জাহমিয়া ও আশায়েরা ইত্যাদি ফিরকাহ আল্লাহর গুণে এবং নামের ক্ষেত্রে শুদ্ধ আকিদা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশুদ্ধ আকিদায় বিশ্বাসী হয়েছে।

এখানে কেবল উদাহরণস্বরূপ কতিপয় ফিরকার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। উক্ত সব ফিরকাহ নতুন ও বাতিল আকিদার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা ঐ আকিদাহ বিশ্বাস নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য ঐ সব ফিরকার আকিদাহ বা বিশ্বাসকে বিশ্বাসগত বিদ'আত বলা যায়। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

চার মাযহাব

সারা বিশ্বে চার মাযহাবের প্রচলন বেশি। তার মধ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা অধিক। মাযহাবধারীদের বিশ্বাস চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব মানা মুসলমানদের জন্য ফরয। তাদের সাথে মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হলে কোন উত্তর না পেলে মাযহাবের দোহাই দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায় এবং এটি আমাদের মাযহাবে নেই। একথা আলেম সাহেবরাও বলে থাকেন। যেমন তাদেরকে যখন বলা হয় যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : "তোমরা সালাতের লাইনে ফাঁক বন্ধ কর।" কিন্তু আপনারা তা করেন না কেন? পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়ান না কেন? আপনাদের এ আমলের কোন দলিল আছে? তখন নিরুত্তর হয়ে বলে, এটি আমাদের হানাফী মাযহাবে আছে। চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব এ বিশ্বাস তাদের রক্ত মাংসে জড়িয়ে আছে বলে এ উত্তর তাদের মুখে শোভা পায়। হায় আফসোস! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মানা ফরয না মাযহাব মানা ফরয এতটুকু জ্ঞান মুসলমানরা রাখে না।

ফরয নফল যে কোন ইসলামী বিধান রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (৮০ হিজরী), ইমাম মালেক (৯৩ হিজরী) মতান্তরে (৯৪ হিজরী), ইমাম শাফেয়ী (১৫০ হিজরী) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ হিজরী) (রাহেমাহুমুল্লাহ) জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমামগণের জন্মের অনেক পূর্বে রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে উক্ত ইমামগণের মাযহাবকে কোন্ নবী মুসলমানদের

ওপর ফরয করেছেন? এ ধরনের আকিদা কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত নয়। রাসূল ﷺ -এর যুগে ও তাঁর পরে সাহাবাগণের যুগে এ আকিদা ছিল না। থাকবে কীভাবে তাদের যুগে তো চার মাযহাবের অস্তিত্বই ছিল না। তবুও তাঁরা দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় জান্নাতের শুভ সংবাদ পেয়েছেন। ঐ আকিদা অর্থাৎ চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা ওয়াজিব যদি ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস হত তাহলে তাঁরা জান্নাতের শুভ সংবাদ পেতেন না। কেননা ইসলামী বিশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়ায় শুভ সংবাদ পাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতই পাওয়া অসম্ভব।

অতএব জানা গেল যে, চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা বা বিশ্বাস করা ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি আকিদা বা বিশ্বাসগত বিদ'আত। ইমামগণ নিজ নিজ মাযহাবকে মানা ওয়াজিব করে যান নি; বরং তারা নিষেধ করে গেছেন। যদিও মাযহাব নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়। তবুও চার ইমামের কিছু উক্তি উল্লেখ না করে পারলাম না। যা দ্বারা প্রমাণিত হবে যে চার মাযহাবের মধ্যে কোন এক মাযহাব মানা ফরয নয়, এ আকিদা অন্যান্য ফিরকার ন্যায় বিশ্বাসগত বিদ'আত।

নবী করীম ﷺ -এর হাদীস অনুযায়ী চার ইমামের অবস্থান

বর্তমান সমাজে মায্হাবপন্থী কতিপয় মানুষ মাযহাব পালন ফরয করে দিয়ে বলেন, প্রচলিত চার মাযহাব (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) পালন করা ফরয। মাযহাব অনুযায়ী ইসলাম পালন করতে হবে। ইসলাম মানার জন্য মাযহাব ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। এমনকি মাযহাব ব্যতীত কুরআন-হাদীসও মানা চলবে না, কুরআন-হাদীসকে যদি মাযহাব সমর্থন দেয়, তাহলে মানা যাবে। সমর্থন না দিলে পালন করা যাবে না। অর্থাৎ মাযহাব অনুযায়ীই কুরআন-হাদীস গ্রহণ করতে হবে, কুরআন হাদীস অনুযায়ী মাযহাব নয়। এজন্যই মাযহাবপন্থীরা কুরআন হাদীসের কথা স্মরণ করে দিলে জবাবে বলেন যে, এ নিয়ম বা 'আমাল আমাদের মাযহাবে নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এ জাতীয় বুলি ও শ্লোগান কি মাযহাবের ইমামদের শিখানো? না ইমামদেরকে এড়িয়ে উপেক্ষা করে মাযহাবের নামে অতিবাড়াবাড়ি ও চরম মিথ্যাচার? একটু চোখ খুলে দেখি মহামতি ইমামগণ কি এরূপ আদেশ করে গিয়েছেন, না তাঁদের নামে এসব অপপ্রচার? যাঁরা স্বীয় যুগে ও স্বস্থানে ইসলামের কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা কি কুরআন-হাদীসকে পরিত্যাগ করে তাঁদের মত ও পথকে আঁকড়ে ধরার কথা বলতে পারেন? না তারা কখনও বলতে পারেন না। এবং কখনো হতেও পারে না। আসুন সত্য ইতিহাস তুলে ধরি।

১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর উক্তি

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ (اَلشَّيْخُ صَالِح الْفَلاَنِىْ، اِيْقَاظِ الْهِمَمِ)

অর্থ : হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটা আমার মাযহাব। (শায়খ সালেহ আল-ফালানী, ঈকায়িল হিমাম পৃ: ৬২)

لاَ يَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَّأخُذَ بِقَوْلِنَا مَالَمْ يَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ اَخَذْنَاهُ (اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، الاِنْتِقَاءُ فِىْ فَضَائِلِ الثَّلاَثَةِ الاَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ)

অর্থ : ততক্ষণ পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না জানা যাবে যে আমরা কোথায় থেকে তা গ্রহণ করেছি। (ইবনে আব্দুল বার, পৃ: ১৪৫, ইবনুল কাইয়্যিম, এলামুল মুআক্কেঈন পৃ: ৩০৯, আশ্‌শারানী, আল মাযীন ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৫)

فَاِنَّنَا بشَرٌ نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. (رَوَاهُ عَبَّاسُ الدُّوْرِىْ فِى التَّارِيْخِ لاِبْنِ مَعِيْنٍ، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ زُفَرَ الشَّيْخُ صَالِحُ الْفَلاَنِىْ فِىْ اِيْقَاظِ الْهِمَمِ)

অর্থ : আমরা মানুষ আজ একটি উক্তি পেশ করি আবার কাল সেটি ফিরিয়ে নেই। (ইবনে মায়ীনের তারিখ গ্রন্থে আব্বাস আদ্দুরী সহীহ সনদে যুফার থেকে বর্ণনা করেন। (শায়েখ সালেহ আল-ফালানী, ঈকাযিল হিমাম)

اِذَا قُلْتُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ ﷺ فَاتْرُكُوْا قَوْلِىْ (اَلشَّيْخُ الْفَلاَنِىْ فِىْ اِيْقَاظِ الْهِمَمِ)

অর্থ : আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতের বিপরীত হয় তাহলে তোমরা আমার কথা বর্জন কর। (শায়েখ সালেহ আল-ফালানী ও ঈকাযিল হিমাম)

حَرَامٌ عَلٰى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِىْ اَنْ يُفْتِىَ بِكَلاَمِىْ (اَلشَّيْخُ الْفَلاَنِىْ فِىْ اِيْقَاظِ الْهِمَمِ)

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার দলিল জানলো না তার জন্য আমার কথায় ফতোয়া দেয়া হারাম। (ঐ)

ইমাম সাহেবের এ ভাষণ সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ ভাষণ তাঁর সততা, জ্ঞানের স্বচ্ছতা এবং ভাষণ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ্ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে তাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ্ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ত্যাগের আদেশ প্রদান করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেই তিনি সত্যিকারে ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় সত্যপথ ও সঠিক মত গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ্ হাদীস বিরোধী কার্যক্রমের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা ঠিক হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ সত্য ভাষণ গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ্ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে অপপ্রচার করে তা পালনীয় আবশ্যক ফতোয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ওপর যুলুম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কার্যক্রম থেকে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া মাযহাবপন্থীরা তাঁকে মুক্ত হতে দিতে চায় না। মহান আল্লাহ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হেদায়াত দিয়েছেন, মাযহাব পন্থীদেরও সেরূপ হেদায়াত দান করুন। আমীন!

যেহেতু ইমাম সাহেব নবী করীম ﷺ থেকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের নিকট দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোও সংকলন হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এ জাতীয় ভাষণ সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও সংরক্ষিত কারণ হলো, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের নিকট দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো, তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোও সংকলিত হয়নি। যেমন সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (র) জন্মলাভ করেন ১৯৪ হিজরী। সহীহ্ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (র) জন্মলাভ করেন ২০৩ হিজরী, অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবূ হানীফার (র) মৃত্যুর ৪৪ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন।

অতঃপর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শুভকামনা এই যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলন হবে, যঈফ (দুর্বল) হাদীস থেকে বিশুদ্ধ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দুর্বল হাদীসের কদর থাকবে না। সহীহ হাদীস সামনে আসলে ঈমানী দাবি হিসেবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা-চেতনাও ধ্যান ধারণার আলোকেই তাঁর অমীয় বাণী "কোন বিষয়ে যখন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ্ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।"

আলোচ্য ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীলভিত্তিক ফতোয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াস অনুযায়ী ফতোয়া দিলেও দলীল ব্যতীত ও কিয়াসভিত্তিক ফতোয়া অনুযায়ী অন্যকে ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দেননি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ্ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফতোয়াগুলো প্রচার প্রসার করা অবৈধ ও হারাম। কারণ এ সব সহীহ্ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়। অথচ ইমাম সাহেব (র) এ বিষয়ে কতইনা সতর্ক ও সচেতন ছিলেন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, "ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যে সব কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ্ হাদীস পেয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ফতোয়া দেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। কাজেই ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা কখনও বৈধ হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও উত্তম আচরণ দেখাতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বীনের জন্য বহু অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ্ হাদীস বিরোধী কথাগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ্ হাদীসই হল তাঁর প্রকৃত মাযহাব। সুতরাং ইমাম সাহেব হলেন এক প্রান্তে, আর ঐসব ভক্তরা হল অন্য প্রান্তে।

২. ইমাম মালেক (র)-এর উক্তি

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخْطِئُ وَاُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِىْ رَاْيِىْ، فَكُلُّ مَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْا (اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِى الْجَامِعِ)

অর্থ : আমি একজন মানুষ ভুল করি আবার ঠিক করি। সুতরাং তোমরা আমার রায়ে বা মতামতের দৃষ্টি ফিরাও অর্থাৎ যাচাই কর। যা কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত তা বর্জন কর। (ইবনে আব্দুল বার, জামে ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২, অনুরূপ ইবনে হাযম উসূলুল আহকাম গ্রন্থে ৬ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠায় এবং সালেহ আল ফালানী তার গ্রন্থে ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।)

ইমাম সাহেবের এ ভাষণে প্রমাণিত হয় যে, পালনীয় বিষয় হলো একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। কোন ব্যক্তির মত, পথ, মাযহাব ও তরীকাহ্ নয়। যদি কারো ফতোয়া কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে, তিনি যে-ই হন এবং যে মাযহাবেরই হন না কেন। আর যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক না হয় তাহলে তিনি যত বড়ই ইমাম ও মুজতাহিদ হন না কেন তার ফতোয়া প্রত্যাখ্যান যোগ্য। এটি শুধু ইমাম মালিক (র)-এর ভাষ্য নয় বরং ইমামে আযম, সাইয়্যেদুল মুরসালীন নবী করীম ﷺ-এর অমীয় বাণী, তিনি এরশাদ করেন–

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ .

অর্থ : "যে ব্যক্তি ইসলামে এমন নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাবে যা ইসলামে (কুরআন ও সহীহ হাদীসে) ছিল না তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।"

لَيْسَ اَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ اِلاَّ النَّبِيِّ ﷺ (اِبْنُ عَبْدِ الْهَادِيِّ فِىْ اِرْشَادِ السَّالِكِ)

অর্থ : নবী করীম ﷺ ব্যতীত এমন কেউ নেই যে তার কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ ব্যতীত কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। (ইবনে আব্দুল হাদী, ইরশাদুল সালেক, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭)

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উক্তি

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهٗ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهٗ اَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ اَحَدٍ (اِبْنُ الْقَيِّمِ، اِعْلاَمُ الْمُوَقِّعِيْنَ ص ٣٦١، اَلْفَلاَنِىْ، اِيْقَاظُ الْهِمَمِ ص ٦٨).

অর্থ : সব মুসলমান একমত পোষণ করেছে যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূল ﷺ-এর সুন্নত প্রকাশিত হবে তার জন্য বৈধ নয় যে, সেটা অন্য কারো কথার জন্য বর্জন করবে। (ইবনুল কাইয়্যিম ৩৬১, আল ফালানী ৬৮ পৃষ্ঠা)

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اَهْلِ النَّقْلِ بِخِلاَفِ مَا قُلْتُ فَاَنَا اُرَاجِعُ عَنْهَا فِىْ حَيَاتِىْ وَبَعْدَ مَوْتِىْ (اَبُوْ نَعِيْمٍ،

اَلْحَلْيَةَ ج ٩/١٠٩، اِبْنُ الْقَيِّمِ، إِعْلاَمُ الْمُوَقِّعِيْنَ ج ٢/ص ٣٦٣، اَلْفَلاَنِيْ، اِيْقَاظُ الْهِمَمِ ص ١٠٤.

অর্থ : আমি যে কথা বলেছি তা যদি রাসূল ﷺ এর যে হাদীস মুহাদ্দেসীনদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত, তার বিপরীত হয় তাহলে তা থেকে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তনকারী। (আবু নাঈম, আল-হিলইয়াহ, ৯ খণ্ড, ১০৭ পৃ:, ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মুআক্কিঈন ২ খণ্ড, ৩৬৩ পৃ: আল-ফালানী ১০৪ পৃষ্ঠা।

كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفُ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلٰى، فَلاَ تُقَلِّدُوْنِيْ (اِبْنُ أَبِيْ حَاتِمُ ص ٩٣، أَبُوْ نَعِيْمٍ وَاِبْنُ عَسَاكِرِ : ج٢/ص٩١٥ سَنَدٌ صَحِيْحٌ)

অর্থ : আমি যা বলেছি তা যদি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে নবীজির হাদীস উত্তম। সুতরাং তোমরা আমার অন্ধানুকরণ কর না। (ইবনে আবি হাতিম ৯৩ পৃ: আবু নাঈম ও ইবনে আসাকীর ২/৯/১৫ সহীহ সনদ।)

এ ছাড়াও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বহু মূল্যবান উপদেশ রয়েছে; বরং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এ জাতীয় ভাষণই সবচেয়ে বেশি ও সুস্পষ্ট। এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর কোন ফতোয়া সহীহ হাদীস বিরোধী হলে তা অবশ্যই তাঁর অজ্ঞাতবস্থায়। এরপরেও সে ফতোয়ার কেউ যেন অন্ধানুসরণকারী না হয় এ জন্য সেসব ফতোয়া থেকে অগ্রীম তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করেছেন এবং অন্ধানুসরণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের সঠিক হিদায়াত দান করুন। আমীন!

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র)-এর উক্তি

لاَتُقَلِّدُوْنِيْ وَلاَ تُقَلِّدُ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ، وَلاَ الْاَوْزَاعِيَّ، وَلاَ الثَّوْرِيْ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا (اِبْنُ الْقَيِّمِ، إِعْلاَمِ الْمُوْقِعِيْنَ ح ٣٠٢، اَلْفَلاَنِيْ، اِيْقَاظُ الْهِمَمِ ص ١١٣) .

অর্থ : আমার তাকলীদ (অন্ধানুকরণ) কর না, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী এবং সাওরীর তাকলীদ কর না। (দ্বীনের বিধান) সেখান থেকে কর যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। (আল ফালানী ১১৪ পৃ: ইবনুল কাইয়্যিম, আল ইলাম, ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃ:)

জনগণ অনুসরণ করবে কুরআন এবং সুন্নাহর, এটি কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা নয়। তিনি যত বড়ই জ্ঞানী, দার্শনিক ও ইমাম হোন না কেন? এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন ইমাম আহমদ (র)। তিনি কোন পক্ষপাতিত্বও করেননি বরং সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়েই আরম্ভ করেছেন। নিষেধ করলেন তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের, এবং আদেশ করলেন কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের। ইমামগণ যেখান থেকে দ্বীন গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে– তোমরাও সে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ কর। কোন ইমামের চিন্তা প্রসূত ফতোয়া থেকে নয়।

رَأْيُ الْاَوْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالِكٍ وَرَأْيُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْيٌ وَهُوَ عِنْدِىْ سَوَاءٌ وَاِنَّمَا الْحُجَّةُ مِنَ الْاٰثَارِ ـ

অর্থ : ইমাম আওযায়ী, মালেক এবং ইমাম আবু হানীফার রায় বা মতামত সেগুলো মতই, সব মত আমার কাছে সমান। তবে দলিল গৃহীত হবে আমার থেকে অর্থাৎ কুরআন-হাদীস থেকে। (ইবনে আব্দুল বার, আল-জামে, ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ عَلٰى شَفَا هَلَكَةٍ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের মুখে। (ইবনে জাওযী, ১৮২ পৃ:)

لَا تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ، فَاِنَّهُمْ لَنْ يَسْلِمُوْا مِنْ اَنْ يَّغْلَطُوْا ـ

অর্থ : "তুমি তোমার দ্বীনের বিষয়ে (নবী-রাসূল ব্যতীত) কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ কর না, কারণ তারা কক্ষণও ত্রুটিমুক্ত নয়।"

জনগণের মাঝে ত্রুটিমুক্ত হলো কেবল নবী-রাসূলগণ। তাই তাঁদের ওয়াহী ভিত্তিক সকল দ্বীনি বিষয় অনুসরণ করা উম্মাতের জন্য আবশ্যক। কিন্তু নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যরা এমন কি সাহাবারাও মাসুম বা ত্রুটিমুক্ত নয়, তাই তাদের তাকলীদ বা অন্ধানুসরণ অবৈধ, বরং তাঁদের কথা যদি সহীহ হাদীসের সাথে মিলে যায় তাহলে অনুসরণে কোন অপরাধ নেই। আর হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ হলে অবশ্যই তা বর্জনীয়।

হাদীস অনুসরণে চার ইমামের অবস্থান প্রসঙ্গে আমরা মহামতি ইমামদের বক্তব্য থেকে সরাসরি জানতে পারলাম যে, তাঁরা হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। স্বেচ্ছায় ও জেনেশুনে কখনও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কথা ও কাজ প্রকাশ করেননি। এমনকি অজ্ঞতাবত কিছু প্রকাশ হয়ে থাকলে সে জন্য আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। সহীহ্ হাদীস পরিত্যাগ করে তাদের ফতোয়া মেনে নেয়া হারাম করে দিয়েছেন এবং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে তা পালন করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অবদানকে কবুল করে নিন এবং তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ আসন দান করুন। আমীন! আর মাযহাবী ও তরীকাপন্থী অন্ধদের সহীহ্ হাদীস দেখার ও পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন!

মাযহাব সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি থেকে আমরা জানলাম যে, তাঁরা চার মাযহাবের মধ্যে কোন এক মাযহাব মানা ওয়াজিব করেন নি; বরং চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব এ ধারণা পোষণ করা বিশ্বাসগত বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ নবী করীম ﷺ ছাড়া মুসলমান কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতে আদিষ্ট হয়। কেননা নবী করীম ﷺ ব্যতীত কেউ ত্রুটিমুক্ত নয়। শরিয়তের বিষয়ে তিনি কোন ভুল করলে আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিতেন। সেজন্য সব মুসলমানের কেবল রাসূলের অন্ধানুকরণ করতে হবে এ বিশ্বাস রাখা প্রতিটি মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য। নবী করীম ﷺ ছাড়া অন্য কারোর জন্য এ ধারণা রাখা বিশ্বাসগত বিদ'আত। সুতরাং চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এ বিশ্বাস, বিশ্বাসগত বিদ'আত।

ইমামদের ফতোয়া কি হাদীস বিরোধী হতে পারে?

প্রসিদ্ধ চার ইমাম ৮০ হিঃ হতে ২৪১ হিজরী এর মধ্যে দুনিয়ায় আগমন করেছেন এবং বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাঁদের বেশিরভাগের সময়টি ছিল এমন যখন প্রসিদ্ধ ছয়টি (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্) হাদীসগ্রন্থ পূর্ণভাবে সংকলিত হয়নি। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রা)-এর বিদায় মুহূর্তেও ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের সূচনা হয়নি বরং অনেকেরই তখন জন্ম হয়নি। যার ফলে হাতের নাগালে সকল হাদীস পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের সাওয়াল জিজ্ঞেসা কখনও থেমে থাকেনি। নিজ নিজ এলাকার প্রসিদ্ধ আলিম হিসেবে সম্মুখীন হয়েছেন নানা ধরনের জটিল প্রশ্নের।

কুরআনসহ যার নিকট যত হাদীস ছিল সে অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন। এবং হাদীসের অবর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে ইজতেহাদ-গবেষণা করে জবাব

দিয়েছেন। ফলে হাদীস বিরোধী কিছু ফতোয়া হওয়াই স্বাভাবিক, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো তাঁদের নির্দেশনা ও সতর্কতামূলক ভাষ্যগুলো। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, "আমি যদি কুরআন ও হাদীস বিরোধী কোন ফতোয়া দেই তাহলে আমার ফতোয়া প্রত্যাখ্যান কর।"

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আমি যে সব ফতোয়া দিয়েছি এর বিপরীত নবী ﷺ-এর সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে নবী করীম ﷺ-এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাবে। সুতরাং আমার কোন অন্ধানুকরণ কর না।" এ জাতীয় সকল ইমামেরই নির্দেশনা। এতে প্রমাণিত হয় ইমামদের কোন কোন ফতোয়া হাদীস বিরোধী হতে পারে। তবে তাঁদের হাদীস বিরোধী ফতোয়া কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে ও স্বজ্ঞানে ছিল না, যেমনটি বর্তমান মাযহাবপন্থী ও তরীকাবাদী গণের মাঝে পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) স্বীয় গ্রন্থ رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ। এ ইমামগণ নিজ ইচ্ছায় হাদীস বিরোধী ফতোয়া দেননি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইমামদের ফতোয়া হাদীস বিরোধী হওয়ার দশটি গ্রহণযোগ্য কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ।

প্রথম কারণ : ইমামের নিকট হাদীস না পৌঁছা

হাদীস না পাওয়ায় চিন্তা-গবেষণা করে ফতোয়া দেন, ফলে ফতোয়া হাদীস বিরোধী হয়ে যায়, মূলত: ইমাম হাদীস পাওয়া সত্যেও হাদীস বিরোধী ফতোয়া দেননি, যেমনটি বর্তমান মাযহাবপন্থী আলিমগণ করে থাকেন।

ইমামদের এ জাতীয় ত্রুটি হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা রাসূল ﷺ-এর একান্ত সাহাবী হওয়ার যারা সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সকাল-সন্ধ্যা রাসূল ﷺ-এর নিকট অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদেরও সকল হাদীস জানা না থাকায় এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আবূ বকর (রা), ওমর (রা) ও আলী (রা)সহ অসংখ্য সাহাবীগণ।

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের নিকট হাদীস পৌঁছেছে কিন্তু বিশুদ্ধতার ধোপে টিকেনি। অর্থাৎ হাদীস অগ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। আবার একই হাদীস ভিন্ন জনের নিকট ভিন্ন সনদে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ : ইমাম হাদীস পেয়েছেন, গ্রহণও করেছেন, কিন্তু পরে তা ভুলে গেছেন, ফলে ইজতিহাদ ভিত্তিক ফতোয়া দিয়েছেন।

চতুর্থ কারণ : হাদীসের শব্দ ও ভাব গাম্ভির্য কঠিন হওয়ায় বুঝের ভিন্নতার তার তম্যের কারণে ফতোয়া বিভিন্ন ধরনের হয়ে যায়।

পঞ্চম কারণ : হাদীসের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকায় বা মানসুখ (রহিত) মনে করে ভিন্ন ফতোয়া দিয়ে থাকে।

কাজেই উপর্যুক্ত কারণে ইমামদের হাদীস বিরোধী ফতোয়া হওয়ায় তাঁরা মা'যুর নিরপরাধ। এছাড়া আরো বড় দিক হলো তাঁরা তাঁদের ফতোয়ার বিপরীত সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে ফতোয়া ছেড়ে দিয়ে হাদীস অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন, কাজেই হাদীস অনুসরণে তাঁদের অবস্থান সঠিক ও নির্ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন!

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মহামতি ইমামদের প্রতি অন্ধ-মুকাল্লিদদের অশোভনীয় আচরণ। তারা ইমামদের অনুসরণের অজুহাত দিয়েও তাঁদের নির্দেশনা ও সতর্কবাণী পালন করতে চায় না। অন্ধ অনুসরণে সহীহ হাদীস ত্যাগেও তাদের বিবেকে এতটুকুও বাঁধে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় করে হেদায়াত দান করুন, আমীন!

ইমামদের প্রসঙ্গে অতিশ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা উভয়ই নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন।

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : "যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় উভয় কি সমান হতে পারে।" (সূরা যুমার : ৯)

কখনও না! যারা জ্ঞানী তাঁরা অবশ্যই জ্ঞানহীনদের চেয়ে অনেক সম্মানী ও মর্যাদাশীল। বিশেষ করে যারা ঈমান আনার পর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

অর্থ : "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু করেছেন।" (সূরা মুজাদালাহ : ১১)

এছাড়াও আলিমদের মর্যাদা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে। রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ .

অর্থ : "তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে না।"

অবশ্য আলিম বলতে সে আলিম মর্যাদার অধিকারী, যিনি হবেন হকপন্থী অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস নিজে পালন করবেন এবং অন্যকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের প্রতি ডাকবেন এবং পালন করার আদেশ দিবে, যেমন– ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ হকপন্থী ইমামগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। যারা নিজের মনগড়া ফতোয়া ও মাযহাবের প্রতি ডাকেননি, বরং ডেকেছেন কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরার প্রতি। পক্ষান্তরে যারা মনগড়া ও হাদীস বিরোধী ফতোয়া, মাযহাব ও তরীকার প্রতি ডাকে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করে তাদের তৈরি করা বিষয়গুলো মানুষকে পালন করতে বাধ্য করে তারা কখনও মর্যাদার অধিকারী নয়।

মাযহাব ও ত্বরীকার অপপ্রভাব

ইমামদেরকে অতিশ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার পিছনে প্রচলিত মাযহাব ও ত্বরীকা পন্থীরাই অনেকটা দায়ী। নিজ মাযহাবের ইমামের প্রশংসা করতে করতে তাকে ফেরেশতা, নবী-রাসূল অথবা আল্লাহর পর্যায় পৌঁছে দেয়া হয়। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চরমপন্থী অনুসারীরা বলেন, "তিনি একাধারে চল্লিশ বছর এশার উযূ দিয়ে ফজর সালাত আদায় করেছেন।" একথার প্রতিবাদ করে আল্লামা ফিরোযাবাদী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বিষয়ে যে সব ডাহা মিথ্যা কথা ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ ইমাম আবূ হানীফার (র) মতো ব্যক্তির উত্তমপন্থা অবলম্বন করাই স্বাভাবিক, তাহলো প্রতি সালাতের জন্য নতুন নতুন অযূ করা। এছাড়াও একাধারে চল্লিশ বছর পূর্ণ রাত্রি জাগ্রত থাকা কোন মানুষের জন্য অসম্ভব বিষয়। কাজেই এসব অবান্তর কথা মূর্খদের ব্যতীত আর কারো হতে পারে না।

এ ছাড়াও সাধারণ জ্ঞানে চিন্তা করলে একজন ইমামের মতো ব্যক্তির জন্য এটি অবশ্যই অশোভনীয়, কেননা কেউ প্রতি রাত জাগ্রত থাকলে তাকে অবশ্যই সারাদিন ঘুমাতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা রাত দিয়েছেন ঘুমের জন্য, আর দিন দিয়েছেন কর্মের জন্য। নবী করীম ﷺ সর্বদা-বন্দেগি গোটা রাত্রি জেগে ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন, তিনিও এরূপ করতেন না, বরং কিছু অংশ ইবাদাত করবে আর কিছু অংশ নিদ্রায় যাবে এটাই রাসূলের ﷺ সুন্নাত। কাজেই ইমাম আবূ

হানীফা (র) সারারাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। তা কিভাবে সম্ভব?

ইমামের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে মর্যাদাহীন করে তুলেছে। আবার কেউ ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমামদের মাসূম বা ত্রুটিমুক্ত বানিয়ে ফেলে। নিজের মাযহাব ও ত্বরীকাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের ইমাম বা পীরকে ফেরেশতায় পরিণত এবং অন্যের ইমাম পীরকে শয়তান ইবলিশ বানানো। এ সব অতি বাড়াবাড়ি মাযহাব ও ত্বরীকার একমাত্র গোঁড়ামীর কারণেই। তাই মাযহাব ও ত্বরীকার গোঁড়ামী ছেড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরলে এবং সকল ইমামকে নিজের ইমাম মনে করলে অতিশ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধা থাকবে না। কেউ ভক্তি আর কেউ বিদ্বেষের পাত্রও হবে না। সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের মাযহাব ও ত্বরীকার অপপ্রভাব থেকে মুক্ত করে খাঁটি মুসলিম ও হকপন্থী ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

মাযহাব মানা ফরয না কুরআন-হাদীস মানা ফরয?

মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের নিকট অবতীর্ণ করেছেন ওহী (কুরআন ও সুন্নাহ)। এ ওহী ভিত্তিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের নামই হল ইসলাম। এ ইসলাম পালন করাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য ফরয।

ইসলাম পালন শুধু রাসূল ﷺ-এর যুগ বা সাহাবী ও তাবেঈদের যুগের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে ও স্থানের সকল মানুষের জন্য একমাত্র ইসলাম মানা ফরয। এ কথায় কোন মুসলমানের দ্বিমত থাকতে পারে না। দ্বিমত থাকলে সে অবশ্যই বিধর্মী। ইসলাম যদি এরূপই হয় তাহলে কেন নবী করীম ﷺ সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যে ইসলাম মানা হতো তা দূরে ঠেলে দিয়ে বিভিন্ন নামে মাযহাব ও ত্বরীকা (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী– কাদেরীয়া, নকশবন্দিয়া ইত্যাদি) তৈরি করা হল এবং মুসলিম উম্মার জন্য তা ফরয বা ওয়াজিব করে দেয়া হল? মাযহাবী ও ত্বরীকাপন্থীদের অপপ্রচার আশ্চর্যের পর আশ্চর্য মনে হয়!

নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের যুগের ইসলাম কি বর্তমানে আচল? অচল না হলে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক ইসলাম বাদ দিয়ে কেন এসব মাযহাব ও ত্বরীকার আবির্ভাব? এ ব্যাপারে কলম ধরলে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তাই কয়েকটি প্রশ্ন ও এর জবাবের আবতারণা করে ইতি টানতে চাই।

প্রশ্ন-১. আল্লাহ তা'আলা কি ওহীর মাধ্যমে মাযহাবী (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) ইসলাম দিয়েছেন? না কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলাম দিয়েছেন?

উত্তর : কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলাম দিয়েছেন। সকল মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত।

প্রশ্ন-২. রাসূল করীম ﷺ কি কুরআন-সুন্নাহর ইসলামই নিয়ে এসেছেন? না মাযহাবী (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) ইসলাম নিয়ে এসেছেন?

উত্তর : রাসূল করীম ﷺ কুরআন ও সুন্নাহর ইসলামই নিয়ে এসেছেন, সকল মুসলিম সমাজ এ প্রসঙ্গে একমত।

প্রশ্ন-৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে এবং রাসূল ﷺ তাঁর সহীহ হাদীসে কি মাযহাবী ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন? না কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর : কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সকল মুসলিম সমাজ একমত।

প্রশ্ন-৪. চার ইমাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) কি কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন? না তাঁদের নামে রচিত মাযহাব মানার নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর : চার ইমাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহীহ সনদে প্রমাণিত তাঁদের বক্তব্যে কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলাম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিরোধী তাঁদের ফাতোয়া হলেও তা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন-হাদীসকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেও সকল মুসলিম সমাজ একমত, কারণ তাঁদের যুগে পৃথিবীর বুকে এসব মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লামা মুহাদ্দিস দেহলবী শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বলেন, হিজরী চারশত বছরের পর এ মাযহাবী অনুকরণ আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন-৫. আমাদেরকে আখিরাতে হানাফী বা মালেকী বা শাফেয়ী বা হাম্বলী বা নকশাবন্দী বা চিশতী বা কাদেরী ইত্যাদি ছিলাম কিনা? এ প্রশ্ন করা হবে না কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম পালন করেছি কিনা? এ প্রশ্ন করা হবে?

উত্তর : কোন মাযহাবে ছিলাম কিংবা না ছিলাম কখনও এ প্রশ্ন করা হবে না। কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলাম পালন করেছি কিনা? এ প্রসঙ্গেও সকল মুসলিম সমাজ একমত।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে যদি সকল মুসলিম সমাজ একমত হয়ে থাকেন, তাহলে মাযহাব ও ত্বরীকার প্রচার আবার কেন? ইমাম তাহাবী (র) যথার্থই বলেছেন :

لَا يُقَلِّدُ اِلَّا جَاهِلٌ اَوْ عَصَبِى .

অর্থ : "অন্ধ অনুসরণের পথ হল গোঁড়াপন্থী জাহেল মূর্খের"

সুতরাং আসুন জাহেলী ও মূর্খতা পরিহার করে, বিভ্রান্তির অপপ্রচার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি এবং ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আঁকড়ে ধরি। কারণ শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস-ই পালন করা ফরয অন্য কিছু নয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তাআ'লার অবস্থান

এ নিখিল বিশ্ব জগতের মাঝে যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহ তাআ'লার এক অপূর্ব ও অনন্য সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টিকুলের সেরা সৃষ্টি হল মানুষ। তাই প্রত্যেক মানুষকেই তার স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য। মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তাআ'লার অবস্থান জানা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। ইহা আল্লাহর প্রতি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। না জানা থাকলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ও বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা সর্বত্র বিরাজমান। হিন্দু ধর্মে অবশ্য এটা স্বীকৃত। আর মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণার আমদানী হয়েছে পীর সুফীদের মনগড়া কিছু ইবাদতের আবরণে চোরাইপথে। ইসলামে এটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র বিরাজমান থাকার ধারণা কুরআন, হাদিস, এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যদি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আকীদা না থাকে তাহলে যতই ইবাদাত ও আমল করা হউক না কেন সে আমল কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

'ওয়াহ্দাতুল উজুদ' বা অদ্বৈতবাদ তথা সৃষ্টি ও স্রষ্টার একই সত্তায় লীন হওয়ার যে ধ্যান-ধারণাটি সুফীবাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, এর থেকেই আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার ধারণাটি জনসাধারণের মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা

আল্লাহ তা'আলার অবস্থানকে যেভাবে বর্ণনা করে থাকেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ–

"এ পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল আগমন করেছিলেন সকলেই মোরাকাবা বা ধ্যান সাধনার মাধ্যমেই নিজের ভিতর আল্লাহকে খুঁজে পেয়েছে।" (এজিদের চক্রান্তে মোহাম্মদী ইসলাম, পৃষ্ঠা- ২৮৮, সুফী সম্রাট দেওয়ানবাগী হুজুরের অনুমোদিত ও প্রকাশিত)

"যারা সাধনার মাধ্যমে নিজের কলবে আল্লাহর সন্ধান লাভ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করে থাকেন তারাই একমাত্র সঠিক পথে আছেন এবং তারাই প্রকৃত মুসলমান।" (ঐ পৃষ্ঠা- ২৬১)

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ফরমান করেন 'আমি তোমাদের হৃদয়ে অবস্থান করি তোমরা কি তা দেখ না?' (শান্তি কোন পথে, পৃষ্ঠা ৩৬, দেওয়ানবাগী হুজুরের অনুমোদিত ও প্রকাশিত)

উল্লেখ্য যে, কুরআনের কোথাও এই আয়াত আমরা খুঁজে পাইনি।

"অধিকাংশ সুফী পীরেরাই একথা বলে থাকেন যে, মুমিনের কলবই হল আল্লাহর আরশ।" (প্রচলিত ভুল, পৃষ্ঠা-১৪, বাশীর বিন মুহম্মদ আল মাসুমী, দারুস সালাফিয়া, মক্কা মোকাররমা) (قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرْشُ اللّٰهِ تَعَالٰى) কেউ কেউ অর্থাৎ মু'মিনের কলব আল্লাহর আরশ–এ বাক্যটিকে হাদীস বলেও চালিয়ে দেন। অথচ হাদীস শাস্ত্রে এ রকম কথার কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। আমাদের দেশের একশ্রেণীর বক্তা বড় মধুর সুরে জনসমাবেশে প্রায়ই এ কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন :

من نه گنجم در زمين واسمان * لكن گنجم در قلوب مؤمنان

"আমি (আল্লাহ) আসমান ও জমিনে জায়গা হইনা তবে মুমিনের কলবের ভেতর জায়গা হয়ে যাই।"

হিন্দুধর্মে আরও ব্যাপকভাবে বলা হয় "ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আসন।" (শ্রমদ্ভগবদগীতা যথায়থ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী)

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বাউলদের মতে– দেহই তাদের দেবালয়। আর তাতে যে জীব তিনিই হলেন শীব। যা আছে দেহ ভাণ্ডারে তা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।" (বাংলার

বাউল, পৃষ্ঠা– ৫৯, ডঃ ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, শান্তি নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়)

শায়খ আল-মাসুমী বলেন : "আর এ ভাবের উপর ভিত্তি করেই সুফীদের মনগড়া কথা- মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ বা আসন।" (প্রচলিত ভুল, পৃষ্ঠা-১৪, শায়খ বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মাসুমী, দারুস্‌সালাফিয়া, মক্কা মোকাররমা)

সুফী পীরদের মোরাকাবার যে পদ্ধতি বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত পাওয়া যায়, তার একটি হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল–

"মোরাকাবাহ বহু প্রকার, সর্ব প্রকারের একটি একত্রিত নিয়ম এই যে, চক্ষু বন্ধ করত কোন আয়াত বা কলেমা জবানে পাঠ করিতে থাকিবে এবং খেয়ালে তার অর্থের প্রতি অতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করত তা কিভাবে হবে, কি নমুনা হতে পারে বা হবে অন্তরে খেয়াল করতে থাকবে। কি নমুনা হবে সে নমুনার খেয়াল ছাড়া এবং কিভাবে হবে সে খেয়াল ছাড়া অন্য কোন খেয়াল যেন অন্তরে আসতে না পারে। একমাত্র এ আয়াতের অর্থের খেয়ালে ডুবে থাকবে। যেমন মোরাকাবাহ শরিয়ত–

আল্লাহ আমার সাথে উপস্থিত	আল্লাহু হাদিরী	اَللّٰهُ حَاضِرِىْ
আল্লাহ আমাকে দেখছেন	আল্লাহু নাযেরী	اَللّٰهُ نَاظِرِىْ
আল্লাহ আমার সাথে আছেন	আল্লাহু মায়ী	اَللّٰهُ مَعِىْ

এখন চক্ষু বন্ধ করত: অন্তরে তা পাঠ করতে করতে মনে মনে আল্লাহ উপস্থিত থাকা, আল্লাহ তা'আলার দেখা এবং আল্লাহ আমার সাথে থাকার খেয়ালকে অতি গভীর মনোযোগের সহিত ধ্যান করতে থাকবে। এমনকি এই ধ্যানে ডুবে থাকবে অথবা এই আয়াতের মোরাকাবাহ করিবে।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ.

অর্থাৎ তুমি যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তা'আলার তোমার সাথে রয়েছেন। (আল-কুরআন)

জাগ্রত, নিদ্রিত, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, একা, সমাজে, যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে থাকিনা কেন আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। এখন নিজের চলা-ফেরা, জাগ্রত, নিদ্রিত, উঠা-বসার খেয়াল কবরত অতি মনোযোগের সাথে সব হালাতে

সব স্থানে আল্লাহর উপস্থিত থাকার ধ্যান করতে থাকবে। এমনকি এই ধ্যান নিজেকে নিমজ্জিত রাখবে। অথবা এ আয়াতের মোরাকাবাহ্ করিবে।

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .

অর্থাৎ তার গর্দানের শাহরগ হতেও আমি তাদের আরও নিকটে আছি।

আরও একটু অগ্রসর হয়ে লিখেছেন এ আয়াতের মোরাকাবাহ্ করিবে–

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ .

অর্থ : যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাবে হবে সেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান রয়েছেন।" (আওরাদে হাক্কানী বা যিকর তরিকত, পৃষ্ঠা–২৩, ২৪, ২৫। মাওলানা শাহ্ গোলাম হাক্কানী, আড়াইবাড়ী দরবার শরীফ হতে প্রকাশিত।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা সংক্ষেপে হল–

১. মু'মিনের কলব হল আল্লাহর আরশ।

২. মু'মিনের কলবই আল্লাহর আসন বা অবস্থান।

৩. আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের সাথেই বিদ্যমান।

৪. সব স্থানেই আল্লাহ্ উপস্থিত।

৫. যারা নিজের কলবে আল্লাহর সন্ধান পেয়েছেন, তারাই সঠিক পথে আছেন এবং তারাই প্রকৃত মুসলমান। ইত্যাদি .....।

প্রথমত আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা কখনো কোন মানুষের সাথে বিদ্যমানও নয় এবং অবস্থানও করেন না। মানুষের কলব আল্লাহ্ তাআলার আরশ বা আসন একথাও ঠিক নয়। সবস্থানে সব হালাতে আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিত থাকার ধারণাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মানিত আরশের উপর সমুন্নত। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

অর্থাৎ "রহমান আরশের উপর সমুন্নত।"

সম্মানিত আরশের উপর সমুন্নত হওয়াটা আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ। এই সমুন্নত হওয়ার ধরন, প্রকৃতি, স্বরূপ ইত্যাদি আমাদের কারো জানা নেই এবং জানার জন্য আমরা আদিষ্টও নই। তবে অবশ্যই আমরা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার উপর ঈমান রাখি। তবে এই সমুন্নত হওয়া

সৃষ্টিকুলের আসীন হওয়ার মত নয়। কেননা তিনি কারো মত নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনি সব শুনেন ও দেখেন।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত নম্বর–১১)

আল্লাহ্ তা'আলার আরশে সমুন্নত হওয়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা আল্লাহ্ তা'আলার সিফ্ফতকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

দ্বিতীয় : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদেরর সাথে রয়েছেন– এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগতভাবে সব স্থানে উপস্থিত থাকা বুঝায় না বরং এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন, সৃষ্টি প্রতি তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা সর্বাবস্থায় সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের ও জানার বাইরে যেমন কিছুই নেই তেমনি তাঁর দৃষ্টি সীমার বাইরেও কেউ নেই। তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সকলকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সব কিছুকে তিনি আরশে সমুন্নত থেকেই পরিচালনা করছেন। এর জন্যে সত্তাগতভাবে তাঁকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

১. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন : "আর আল্লাহর বাণী: "তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন" এর দ্বারা তিনি নিজের জ্ঞানকে উদ্দেশ্যে করেছেন। নিজের সত্তাকে উদ্দেশ্যে করেননি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা তিনি আমাদের সাথে আছেন। (আল আসমা ওয়াসসিফাত, মাজমুউল ফতওয়া ৫/১৯৩)

২. ইমাম ইবনে কাছীর (রহ) বলেন : "এ আয়াত দ্বারা জ্ঞানগত দিক থেকে আল্লাহর সাথে থাকা উদ্দেশ্যে হওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মত অভিমত বর্ণনা করেছেন এবং এটি উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই।" (তফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৩৪০)

৩. ইমাম আবু আমর তালমনকী (রহ) বলেন : "আহলে সুন্নাত এর অনুসারী মুসল্লিগণ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন' এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে একমত যে, এটি তাঁর ইলম বা জ্ঞান। আর আল্লাহ্ তাআলা নিজে আকাশমণ্ডলীর উপরে আরশে সমুন্নত রয়েছেন, যেমনি তিনি ইচ্ছা করেছেন।" (মাজমুউন ফাতওয়া ৫/৫১৯)

৪. তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতের অর্থ করা হয়েছে "অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক জ্ঞানের দ্বারা তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন।" (তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠ-৪৩০)

আল্লামা সা'দউদ্দিন তাফ্তাজানী (রহ) বলেন-

"তফসীরকারগণ সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যেখানে সাথে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে জ্ঞান দ্বারা সাথে থাকা, সত্তাগতভাবে সাথে থাকা নয়।" (মাজমুউল ফাতওয়া আব্দুল হাই ১/৩৪, ২/৮)

একইভাবে فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এই আয়াত দ্বারাও আল্লাহর সর্বত্র বিদ্যমান বা বিরাজমান হওয়া বুঝায় না।

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের অর্থ করেছেন-

"পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই মুখ কর তা-ই আল্লাহর কিবলা।" তফসীর বিশারদগণ বলেছেন যে, আয়াতটি সালাতের কিবলা সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিল হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চেহারা ফিরিয়ে সালাত আদায় করা হত। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। আর রহিতকারী আয়াতটি হল-

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ -

"তোমরা যেখানেই থাকবে তোমাদের চেহারাকে কাবার দিকে ফিরাবে।"

২. তফসীর বিশারদ মুজাহিদ এই আয়াতের অর্থে বলেন : "যেখানেই তোমরা থাকনা কেন তোমাদের জন্য রয়েছে কিবলা। আর তা হলো কা'বা ।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর (সংক্ষিপ্ত) ১/১১০)

৩. ইমাম তিরমিজী (র) বলেছেন : "এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা যেদিকেই চেহারা ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর কিবলা রয়েছে।" (তিরমিযী, ২/১২৪) কিন্তু পরবর্তীতে আয়াতটির হুকুম রহিত বা মনসুখ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : "যতদূর স্মরণ হয় কুরআনের যে বিধান আমাদের জন্য সর্বপ্রথমে রহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে কিবলা পরিবর্তনের বিষয়। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/১৬৮)

৪. তাফসীর বিশারদ কাতাদা (রহ) বলেন- "রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে-

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

তুমি তোমার চেহারাকে মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।" (তাফসীরে কুরতবী ২/৮৩)

অতএব এই আয়াত فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ মানসুখ বা রহিতকরণ আয়াত যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সবদিকে বিদ্যমান একথা প্রমাণ করে না।

আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সর্বাগ্রে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, যে আরশে আল্লাহ্ তা'আলা সমুন্নত সেই আরশটির অবস্থান কোথায়? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

اَلْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللّٰهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ

"আরশ হচ্চে পানির উপর, আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন আরশের উপর। এতদসত্ত্বেও তোমরা যা কিছু কর তা তিনি ভালভাবে অবগত।" (আবু দাউদ)

রাসূল (সা) আরও বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمٰوَاتِهِ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নিজ আরশের উপরে রয়েছে এবং তাঁর আরশ হচ্ছে সমস্ত আসমানের উপর।" (আবু দউদ, শরহে আকীদা তাহ্ভিয়া/২৯৪) তাই, মানুষের কলব আল্লাহর আরশ বা আসন অথবা সর্বত্রই আল্লাহ্ তা'আলা বিরাজমান বা বিদ্যমান– এই ধরনের বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান

আল্লাহ্ তা'আলা আরশে আজীমে সমুন্নত -এ কথার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হল –

প্রত্যক্ষ আয়াতসমূহ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

١. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -

১. "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান সমূহ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছে।" (সূরা আরাফ, আয়াত নম্বর ৫৪)

٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ

২. "আল্লাহ উর্ধ্ব জগতে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করছেন কোন প্রকার স্তম্ভ ব্যতীত যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ, অত:পর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।" (সূরা রাদ, আয়াত নম্বর-২)

٣. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ

৩. "নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।" (সূরা ইউনুস, আয়াত নম্বর-৩)

٤. اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ـ

৪. "দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন।" (সূরা-ত্ব-হা, আয়াত নম্বর-৫)

٥. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

৫. "তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর আরশে সমুন্নত হয়েছে। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত তাকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা ফুরকান, আয়াত নম্বর-৫৯)

٦. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سَتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ

৬. "(আল্লাহ) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু ছয়দিনের সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছে।" (সূরা সিজদাহ, আয়াত নম্বর-৪)

٧. اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

৭. "তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি ছয়দিনের নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, অত:পর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছে। (সূরা হাদিদ, আয়াত নম্বর-৪)

٨. ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ.

৮. "সেই সত্তা সম্পর্কে তুমি কি নির্ভয় হয়ে গেলে যিনি আকাশে আছেন এবং যিনি যমিনে তোমাকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন, অত:পর তা থরথর করে কাঁপতে।

হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত আছেন যে আরশ খানা সপ্তাকাশের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। তিনি সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন।

١. وَعُرِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَتّٰى كَلَّمَهُ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

১. "রাসূলুল্লাহ (সা) কে সপ্তাকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, এমনকি তাঁর সাথে তাঁর প্রতিপালক কথা বলেন এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন।" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ, দারেমী)

٢. اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

২. "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া করো (তাহলো) আকাশ যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

٣. اَلَا تَأْمَنُوْنِىْ وَاَنَا اَمِيْنٌ مَنْ فِى السَّمَاءِ

৩. "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখো না, আমি ঐ সত্তার নিকট আস্থাভাজক যিনি আকাশে আছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤. وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللّٰهُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ـ

৪. "রাসূল (সা) বলেন, আরশ পানির উপর, আর আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর এবং তোমরা যে অবস্থায় আছো তা তিনি সম্যক অবহিত।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

٥. تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ اَهَلُوْكُنَّ وَزَوَّجَنِىَ اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ ـ

৫. রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রী যয়নব বিনীত গর্বে অন্য সপত্নিদেরকে বলতেন, "তোমাদের আত্মীয়স্বজন তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন (কিন্তু) আমার বিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ যিনি সাত আকাশের উর্ধ্বে (বিরাজমান)।" (মুসলিম, তিরমিযী) উল্লেখ যে, রাসূল (সা)-এর পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নব তালাকপ্রাপ্তা হলে আল্লাহ আদেশেই তিনি যয়নবকে বিয়ে করেন।

٦. اَنَّ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةٌ فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللّٰهُ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّمَا مُؤْمِنَةٌ.

৬. "রাসূলুল্লাহ (সা) কৃতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলল : আকাশে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমি কে? সে জবাবে বলল : আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আদেশ দিলেন : তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে মু'মিনা অর্থাৎ বিশ্বাসিনী।" (মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ)

ঘটনাটা ছিল এরূপ , মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস্‌সুলামী (রা) বলেন, আমার একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে আমার বকরীসমূহ ওহুদ ও জোয়ানিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকায় চড়াত। একদিন সে এসে বলল যে, একটা নেকড়ে এসে

একটা ছাগল নিয়ে গেছে। যেহেতু আমি একজন মানুষ এবং যে যে কারণে মানুষ রাগান্বিত হয় আমিও তা থেকে মুক্ত নই। তাই রাগে তাকে একটা চড় দিয়ে বসি। তারপর রাসূল (সা) এর নিকট উপস্থিত হলাম। কিন্তু ঐ ঘটনা আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। আমি বললাম : হে আল্লাহ রাসূল (সা) আমি কি তাকে মুক্ত করে দেব? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। উপস্থিত করার পর আল্লাহর রাসূল (সা) ক্রীতদাসীকে উপরোক্ত প্রশ্ন করলেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, বরাতে: আল-আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮, শায়খ ড: মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু, শিক্ষক, দারুল হাদিস, মক্কা মোকাররমা)

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করাও যেমন শরীয়ত সম্মত তেমনি আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাও ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্ত।

আল্লাহর রাসূল (সা) এর সাহাবাগণ এবং তাবেঈগণের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অবস্থান

আল্লাহর রাসূল (সা) এর সাহাবাগণ এবং তাবেঈগণ সকলেই এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর আরশে সমুন্নত এবং তাঁর আরশখানা সপ্তম আকাশের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। যেমন–

১. আবু বকর (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) এর ইবাদত করত তার জানা উচিত যে, মুহাম্মদ (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলার আসমানের উপর রয়েছে যিনি চিরঞ্জীব এবং যার মৃত্যু নেই।" (দারেমী)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল (সা) এর ইন্তেকালের পর পর যখন আবেগতাড়িত হয়ে এই মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিচ্ছিলেন না তখন আবু বকর (রা) সকলের উদ্দেশ্যে খুতবায় একথা বলেন।

২. আবু বকর (রা) অন্যত্র বলেন : "আমি আসমানের সংবাদ প্রদানে রাসূলুল্লাহ (সা) কে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তবে কি এই ঘটনায় (মিরাজে গমন) তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করব না? (হাকেম) উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা) এর মিরাজ গমনের সংবাদ মক্কার কুরাইশদের কাছে অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য ছিল বিধায় তারা আবু বকর (রা) এর শরণাপন্ন হলে তিনি একথা বলেন। আর এ কারণেই তিনি 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত হন।

৩. একদা উমর (রা) কতিপয় সঙ্গী সাথী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলাদের সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে থামতে বললেন এবং উমর (রা) সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। মাথা নিচু করে দীর্ঘ সময় তাঁর কথা শুনলেন এবং কথা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন। এ বৃদ্ধা মহিলার জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এতক্ষণ দাঁড় করে রেখেছেন? উমর (রা) বললেন : সে কে, তা-কি জান? এ যে খাওলা বিনতে সালাবা (রা) এ তো সেই মহিলা সাত আসমানের উপর থেকে তার সম্পর্কে আল্লাহর নাযিল করেছেন–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ۔

"আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছে।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৩৩৬, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুজাদালার টিকা নম্বর ২, শরহে আকিদা ত্বহাবিয়া/৩৭৯)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : "(আকাশ ও পৃথিবীতে) কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহর তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত ছিলেন। অত:পর সর্বপ্রথম তিনি সৃষ্টি করেন কলম।" (ফাতহুলবারী ১৩/২৪৪)

৪. হাস্সান বিনতে সাবেত (রা) বলেন : "আমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) হলেন সেই সত্তার পক্ষ থেকে রাসূল যিনি আকাশমণ্ডলীর উপর দিয়েছেন।" (শরহে আকীদা আত্তাহাভিয়া /২৯৩)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর কাফেরদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। নিশ্চয়ই পানির উপর রয়েছে আল্লাহর আরশ। আর এ আরশের উপর রয়েছে মহান রাব্বুল আলামিন। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ১/১০)

৬. "আল্লাহর রাসূল (সা) এর ইন্তেকালের পর একদিন আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) এ দুজনে মিলে উম্মে আয়মান (রা) এর বাড়ীতে তাঁর খোঁজ খবর নিতে গেলেন। তাদেরকে দেখে উম্মে আয়মান (রা) অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তাঁরা কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, অন্য কোন কারণে কাঁদছি না। শুধু এ

জন্য কাঁদছি যে আল্লাহ্ রাসূলের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ কথায় প্রভাবিত হয়ে আবু বকর (রা) ও উমর (রা) উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

৭. কা'বুল আহ্বার (রা) উমর (রা) কে বলেন, "আমরা (তাওরাতে) পেয়েছি যে, আসমানের বাদশাহের (আল্লাহর) পক্ষ হতে পৃথিবীর বাদশাহের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় রয়েছে। উমর (রা) বললেন তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে আত্মসমালোচনা করে। কাবর (রা) বললেন, হ্যা, সে ব্যতীত যে আত্মসমালোচনা করে। উমর (রা) তখন আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। (কিতাবুল মারাসীল ইবনে আবী হাতেম /৮১)

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন– "রুহসমূহকে ঘুমের মধ্যে আসমানে উঠানো হয়। অত:পর আরশের কাছে তাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং যে রুহ্ পবিত্র সে আরশের কাছে সিজদা করে, আর যে রূহ পবিত্র নয় সে আরশে থেকে বহু দূরে সিজদা করে।" (মুখতারু মিনহাজিল কাসেদীন /৬২)

৯. উম্মুল মু'মিনীন যয়নব (রা) রাসূল (সা) এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বললেন : "তোমাদেরকে তোমাদের পবিবার পরিজন বিবাহ দিয়েছেন, আর আমাকে রাসূলের সাথে বিবাহ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর থেকে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি রাসূল (সা)-কে বলেছেন : আরশের উপর থেকে দয়াময় আল্লাহ আমাকে আপনার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। (বুখারী, ফতহুলবারী ১৩/৩৫০)

১০. উম্মে সালামা (রা) কুরআনের আয়াত : اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى। অর্থাৎ রহমান আরশে সমুন্নত-এর ব্যাখ্যা বলেছেন– 'সমাসীন হওয়া অজ্ঞান নয়, তবে এর ধারণাটা বোধগম্য নয়। ইহা স্বীকার করা হচ্ছে ঈমান আর অস্বীকার করা হচ্ছে প্রকাশ্য কুফরী। (ফতহুলবারী ১৩/২৪৫, ফতহুল কাছীর ২/২১১, তফসীর কুরতুবী ৭/২২০)

১১. আবুল ওদ্দাক (রহ্) বলেন : আমি ইবনে উমরকে সফরের দু-রাকাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আসমান হতে অবতীর্ণ রোখসাত বা বিশেষ অনুমতি। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৯৯)

১২. মাসরুক (রহ্) যখন আয়েশা (রা) হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন : "মাসরুক (রহ.) যখন আয়েশা (রা) হতে কোন হাদীস বর্ণনা

করতেন তখন বলতেন : "সাত আকাশের উপর থেকে নির্দোষ প্রমাণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) এর প্রিয়তমা এবং সিদ্দিকের মেয়ে সিদ্দিকা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।" (এগাসাতুললুহাফান ২/১৪০)

উল্লেখ্য যে, আয়েশা (রা) এর বিরুদ্ধে মুনাফিকরা অপবাদ রটিয়েছিল যা ইফকের ঘটনা হিসেবে খ্যাত। আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ও নির্দোষ প্রমাণ করেন।

প্রখ্যাত চার ইমামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন : "আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এ অবস্থায় যে, আরশের প্রতি তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। এবং এর উপর স্থির হয়ে থাকারও কোন প্রয়োজন নেই।" (শরহুল ফিক্হিল আকবর /৬১)

২. জনৈক মহিলা ইমাম আবু হানিফা (রহ) কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার মা'বুদ কোথায় যার ইবাদত আপনি করছেন? উত্তরে আবু হানিফা (রহ) বলেন– আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর। তিনি পৃথিবীতে নন। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল আপনি কি আল্লাহর বাণী وَهُوَ مَعَكُمْ তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন' দেখেননি? ইমাম আবু হানিফা বললেন, এটি এরকম যে, তুমি কারো নিকট লিখলে যে, আমি তোমাদের সাথে আছি অথচ তুমি তার নিকট উপস্থিতও নও বরং অনেক দূরে। (এতেকাছুল আয়িম্মাতিল আরবায়া /১৩, আল আসমা ওয়াস সিফাত–২/১৭০)

৩. ইমাম ইবনে আবীল ইজ্জ আল হানাফী (রহ) লিখেছেন : "তিনি (আবু মুতী আল-বলখী) বলেন যে, তিনি আবু হানিফা (রহ) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, ব্যক্তি বলে , আমি জানিনা আমার 'পালনকর্তা' কোথায় আকাশের উপর না পৃথিবীতে? তিনি বলেন, সে কাফের। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন "রহমান আরশে সমুন্নত" (ত্ব-হা/৫) আর তাঁর আরশ হচ্ছে সপ্তাকাশের উপর। আমি বললাম, যদি সে বলে, আল্লাহর আরশের উপর তবে আরশ আসমানে না পৃথিবীতে তা আমি জানি না। তিনি বললেন, সেও কাফের। কেননা, আল্লাহ্ যে আসমানে সে তা অস্বীকার করছে। আল্লাহ্ যে আসমানে একথা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফের।" (শরহে আকিদা ত্বহাভিয়া/৩৮৭, কিতাবুল উলু লিযযাহাবী /১৩০, মাজমুউল ফাতওয়া লিইবনে তাইমিয়া–৫/৪৭-৪৮, আল ফিকহুল আবসাত/৪৬, ইতেকাদুল আইম্মাতিল আরবা/১২, শরহে ফেক্হ আকবর/১৭১)

৪. ইমাম মালেক (রহ) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর রয়েছেন। আর তার জ্ঞান রয়েছে সর্বত্র। কোন স্থানই তাঁর জ্ঞান শূন্য নয়।" (আল ইন্তেকা/৩৫, মজুমুউল ফাতওয়া ৫/৫৩, এতেকাদুল আয়িম্মা আল আরবা/৩০ মাসাইলুল ইমাম আহমদ /২৬৩)

৫. তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করেনা যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে রয়েছেন সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ।" (মাজমুউল ফাতওয়াহ ৫/২৫৮)

৬. তিনি আরো বলেন : "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আকাশমণ্ডলীর উপরে সেই মা'বুদ নেই, যার ইবাদত করা হয় অথবা আরশের উপর সেই মাবুদ নেই যার উদ্দেশ্যে সালাত-সেজদা নিবেদন করা হয়। অথবা মনে করে যে, মুহাম্মদ (সা) কে মে'রাজের রাত্রে তাঁর প্রভুর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়নি এবং তাঁর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি তাহলে সে আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী ফিরআউনের অনুসারী পথভ্রষ্ট ও বিদআতী।" (মাজমুউল ফাতওয়া ৫/২৫৮)

৭. ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আসমানে আরশের উপর রয়েছে। সেখানে থেকে তিনি যেভাবে ইচ্ছে করেন নিজ সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছে করেন দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।" (এতেকাদুল আয়িম্মায়ে আরবিয়া / ৪০, মাজমুউল ফাতওয়া ৪/১৮১, মুখতাসারুল উলুনিল-আলবানী/১৭৬)

৮. তিনি আরো বলেন : "আখেরাতে আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দেখা যাবে, ঈমানদারগণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। তারা আল্লাহ কথা শুনতে পাবেন এবং তিনি আরশের উপর রয়েছে।" (মাজমুয়া ফতোয়া আব্দুল হাই ২/৬)

৯. তিনি আরো বলেন: "আবু বকর (রা) এর খেলাফত সত্য। আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর তার ফায়সালা করেছেন এবং মানুষের অন্তরসমূহকে তার উপর একত্র করেছেন বা জুড়ে দিয়েছেন।" (মাজমুউল ফাতওয়া ৫/৫৩)

১০. ইমাম আহমদ (রহ) বলেছেন : "আমরা বিশ্বাস করি সে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর রয়েছেন যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে। (এতেকাদুল আইম্মাতিল আরবায়া/৬৪)

বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান

১. ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন : "আল্লাহ তায়ালা যে সমগ্র সৃষ্টির উপরে আরশের উপর রয়েছেন, তিনি যে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক-সৃষ্টির কোন কিছুর

মধ্যে প্রবেশকারী নন এবং তার ইলম বা জ্ঞান যে সর্বত্র রয়েছে এ বিশ্বাসের প্রমাণ হচ্ছে কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে, কেরাম, তাবেঈ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত অভিমত।" (কিতাবুল উলু, মাজমুয়া ফাতওয়া আব্দুল হাই ২/৫)

২. ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদ (র) বলেন, "আমাদের মহিয়ান গরিয়ান প্রভু আরশের উপর রয়েছেন। এটি আহলে সুন্নাত আল জামায়াত ও ইসলামের সকল ইমামের কথা।" (মাজমুউল ফাতওয়া আব্দু হাই ১/২৯২)

৩. ইমাম আওযায়ী (রহ) বলেন, "তাবেঈগণ যখন প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান ছিলেন সে অবস্থায় আমরা বলতাম যে, মহান আল্লাহ্ আরশের উপর রয়েছেন। রাসূল (সা) এর হাদীসে তার যে সব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে আমরা সেসব বিশ্বাস করি। (আল আসমা ওয়াস সিফাত /৪৮০, ফাতহুল বারী ১৩/৩৪৫)

৪. ইমাম বুখারী (রহ) বলেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীর উপরে নিজ আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তার তাঁর আকাশমণ্ডলী হচ্ছে পৃথিবীর উপর।" (খাল্কু আফআলিল ইবাদ, মাজমুউল ফাতওয়া আব্দুল হাই ২/৩)

৫. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) বলেন, : "আমরা আমাদের পালনকর্তাকে এভাবে চিনি যে, তিনি সপ্তাকাশের উপর নিজ আরশে সমুন্নত রয়েছেন। তিনি সৃষ্টি থেকে পৃথক এবং অনেক দূরে।" মাজমুউল ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ৫/৫২)

৬. আব্দুল কাদের জিলানী (রহ) বলেন, "সে (মুসলিম) জ্ঞানে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও একক। তিনি উর্ধ্বাদিকে রয়েছেন অর্থাৎ আরশে সমুন্নত। তাঁর জ্ঞান সবকিছু বেষ্টন করে আওছে। তাকে সর্বত্র বিরাজমান বলা জায়েয নেই। বরং বলতে হবে যে, তিনি আসমানের উপর আরশে রয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন রহমান আরশের উপর সমুন্নত।" (গুনিয়াতুত তালেবীন, মাজমুউল ফাতওয়া ৫/৮৫)

৭. মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, "সলফে-সালেহীন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আরশে সমুন্নত হওয়া এটা তার বিশেষ গুণ বা সিফত, যার ধরণ ও স্বরূপ অজ্ঞাত। আমরা এ গুণে বিশ্বাস করি এবং এর জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করি।" (মাজমুয়া ফাতওয়া আব্দুল হাই ১/২৯৩)

৮. সৌদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী এবং উনবিংশি শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ বিন বা'জ (রহ) বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান, সে পথভ্রষ্ট হুলুলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

পূর্বোল্লিখিত দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বদিকে রয়েছেন। তিনি সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক, আরশে সমুন্নত। যদি সে কুরআন , হাদীস ও ইজমা'র দলিলের আনুগত্য স্বীকার করে তো ভাল। অন্যথায় সে ইসলাম বিমুখ মুরতাদ-কাফের।" (মাজাল্লাতুল হাজ্জ/৭৫, নভেম্বর ১৯৯৪ ইং সংখ্যা)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান নন এবং তিনি তাঁর মহান আরশে সমুন্নত আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন এবং ক্ষমতা সর্বব্যাপী বিদ্যমান। স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুটি পৃথক সত্তা এবং দুয়ের অবস্থানও বহুদূরে। আল্লাহ তায়ালা মহান সত্তাকে পৃথিবীর মাটিতে টেনে আনার বিশ্বাস অদ্বৈতবাদী, অবতারবাদী ও জন্মান্তরবাদী হিন্দু-বৌদ্ধদের বিশ্বাস। যেমন–গীতা শ্রকৃষ্ণ বলেন–

"অথবা বহুনেতেন কিং জ্ঞাতেন তর্বার্জনু"

বিষ্ঠভ্যহমিদং কৃতস্নমকোংমেন স্থিতো জগত।

অনুবাদ : হে অর্জ্জুন! অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার একাংশ দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি। তাই পরমেশ্বর ভগবান সর্বভূতে পরমাত্মারূপে সৃষ্টি হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান ।" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথায়থ পৃষ্ঠা ৫২৫, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল উভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী, মায়াপুর, ভারত।)

অতএব আমাদেরকে প্রচলিত বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে কুরআন ও হাদিসের সঠিক আকিদার দিকে ফিরে আসতে হবে। তাহলেই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার আরশে আসীন সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ) -এর কথা দিয়ে শেষ করতে চাই। তিনি বলেন–

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ.

"আল্লাহর (আরশের উপর) সমুন্নত হওয়া জানা কথা, তবে এর ধরন প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাত। এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত এর উপর ঈমান আনা ওয়াজীব।" (একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন।)

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

মাযহাব পালন করা ফরয না কুরআন-হাদীস পালন ফরয? শীর্ষক আলোচনায় তৃতীয় প্রশ্নের জবাব ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল কুরআন ও হাদীস পালন

করা, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ۔

অর্থ : "(হে মানুষেরা!) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ কর না। তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা আরাফ : ৩)

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ হলো একমাত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণ করতে হবে এবং কুরআন-হাদীস বিরোধী সকল মাযহাব তরীকাহ ও দল-মত ত্যাগ করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন, যেমন– সূরা বাক্বারাহ-২১৩, সূরা নিসা ৫৯, সূরা আন'আম-১০৬, সূরা আহযাব-২, ও সূরা জাছিয়াহ ১৮ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনে ঈমানদার ও কাফিরদের অবস্থান

আল্লাহ্ তা'আলার এ কঠিন নির্দেশের অগ্নী পরীক্ষায় মানবসমাজ হয় পালন করবে, কিংবা পালন করবে না। সব দল-মত, চিন্তা-চেতনা, ছল-চাতুরী ও মাযহাব-ত্বরীকাহ ছেড়ে যারা বীর-মুজাহিদের ন্যায় লাব্বাইক বলে সাড়া দিবে এবং শ্রবণ করলাম ও সাথে সাথে মেনে নিলাম বলে ঘোষণা দিবে তারাই হবে সফলকামী।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ۔

অর্থ : "মুমিনদের বক্তব্য তো এই– যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর এরাই সফলকাম। আর যারা আল্লাহ্ ও

তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তাঁরাই সফলকাম।" (সূরা নূর : ৫১-৫২)

সুতরাং আল্লাহর নির্দেশে ঈমানদার ব্যক্তির অবস্থান হবে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তথা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ শুনামাত্রই তা পালনের স্বীকৃতি দিবে এবং তা দৃঢ় আঁকড়ে ধরবে। কোন রকমের ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিবে না। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার নয় তাদের জবাবও আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : "যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো। তখন তারা বলে : আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যার ওপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি, যদিও তাদের পূর্ব পুরুষগণ কোন জ্ঞান রাখত না এবং হিদায়াত প্রাপ্তও ছিল না।" (সূরা মায়িদা : ১০৪)

আলোচ্য আয়াত দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন ও হাদীসের ডাকে পূর্ব পুরুষগণের মতবাদ, মাযহাব ও ত্বরীকার কোন অজুহাত চলবে না। কারণ শুধু কুরআন ও হাদীস-ই অনুসরণীয়, আর কুরআন-হাদীস বিরোধ পূর্ব পুরুষগণের মতবাদ, মাযহাব ও ত্বরীকাহ সবই বর্জনীয়। এরপরও যদি কেউ তা আঁকড়ে ধরতে চায় তা হবে প্রকাশ্য কাফিরদের অবস্থান। কেননা ঈমানদারের অবস্থান হলো কুরআন-হাদীস শুনামাত্রই অনুসরণ করা, আর কাফিরদের অবস্থান হল নানা ধরনের ছল-চাতুরী ও অজুহাত দিয়ে কুরআন ও হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ তা'আলা। আমাদের সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

কাজের মাধ্যমে বিদ'আত

নেকি বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু কাজের উদ্ভাবন করা যাতে রাসূল ﷺ-এর অনুমোদন নেই তাকে শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে। এ প্রকার বিদ'আতকে প্রথমত, দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রকৃত বিদ'আত, ২. সংযোজিত বিদ'আত।

১. প্রকৃত বিদ'আত : দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ সৃষ্টি করা শরিয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন : মিলাদুন্নবী ও জন্মবার্ষিকী পালন ইত্যাদি।

২. সংযোজিত বিদ'আত : এমন কাজ শরিয়তে যার ভিত্তি আছে, তবে তাকে কেন্দ্র করে এমন কিছু পথ বা পদ্ধতি সংযোজন করা শরিয়তে যার কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। যেমন : দু'আর প্রমাণ আছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, দু'আই হচ্ছে ইবাদত; কিন্তু এই দু'আকে কেন্দ্র করে সালাতের পর জামা'আতবদ্ধ হয়ে যে দু'আ করা হয় ইমামের নেতৃত্বে এর কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই। (আল-বিআতু ওয়া যাওয়াবিতুহা ওয়া আসারহা আসসাইয়্যি ফিল উম্মাহ : ড. আলী বিন মুহাম্মদ বিন নাসের আল-ফেকুহী।)

যিকির : এটি একটি শরিয়তসম্মত কাজ। আল্লাহ্ বলেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۔

অর্থ : আল্লাহর স্মরণে কি অন্তর প্রশান্তি হয় না? রাদ : ২৮ (নিশ্চয়ই হয়)।

এটিকে কেন্দ্র করে এমন অভিনব বা মাতলামি পথ আমদানি করা হয়েছে ইসলামে তার কোন গন্ধও নেই। যেমন জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসে তসবীহের দানা হাতে নিয়ে মাথা হেলিয়ে হু হু করা। মোটকথা যে কাজের ভিত্তি ইসলামে আছে তাকে কেন্দ্র করে কোন নতুন পদ্ধতির সংযোজনকে সংযোজিত বিদ'আত বলে।

প্রকৃত বিদ'আত অর্থাৎ এমন আমল যার ভিত্তি ইসলামে নেই এ প্রকার বিদ'আত হতে সতর্ক থাকা সহজ। কেননা এটি স্পষ্ট বিষয়: কিন্তু সংযোজিত বিদ'আত সৃষ্টি হয় তা থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষ সতর্ক থাকতে সক্ষম হয়। কারণ এটি খুব সূক্ষ্ম সবার চোখে ধরা পড়ে না।

বিদ'আতে হাসানাহ (উত্তম বিদ'আত)
বিদ'আতে সাইয়্যেআহ (মন্দ বিদ'আত)

বিদ'আতপ্রেমী মানুষকে বিদ'আতের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করলেও তা মানতে চায় না। নাম পরিবর্তন করে তার বিষাক্ত শরাব পান করতে চায়। এ লক্ষ্যে

তারা বিদ'আতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে– ১. বিদ'আতে হাসানা (উত্তম বিদ'আত), ২. বিদ'আতে সাইয়্যেআহ (মন্দ বিদ'আত)

সুদখোররা যেমন সুদের নাম পরিবর্তন করে ইন্টারেস্ট বলে চালিয়ে দেয়, তেমনি বিদ'আত প্রেমিকরাও নাম পরিবর্তন করে সুন্নাত বলে চালিয়ে দিয়ে আমল করে। তবে রাসূল ﷺ তাদের চালাকির গলা কেটে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন :

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (أَبُوْدَاوُدَ : ٤٦٠٧ وَالتِّرْمِذِيُّ : ٢٦٧٦)

অর্থ : দ্বীনের নামে সকল প্রকার নতুন কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক। কারণ দ্বীনের নামে সকল নতুন কাজ বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আত, ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে উত্তম এবং সহীহ বলেছেন।)

উক্ত হাদীস থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম যে ইসলামের বিদ'আতে হাসানাহ সাইয়্যেআহ বলে কোন কিছু নেই। সব বিদ'আত সমান এবং ভ্রষ্টতা। শায়েখ সফিউর রহমান (র) বলেছেন : বিদ'আতকে 'বিদ'আতে হাসানাহ' ও 'বিদ'আতে সাইয়্যেআহ' দু'ভাগে বিভক্ত করাও বিদ'আত।

বিদ'আত শয়তানের মিষ্টি ছুরি

শয়তান যখন আল্লাহ্ ভীরু মানুষের তার আনুগত্য করাতে ব্যর্থ হয় তখন সে বিদ'আতকে মিষ্টি ছুরি হিসেবে ব্যবহার করে এবং আবেদ আলীর গলা কাটে ও আমল বিনষ্ট করে। অথচ আবেদ আলী টেরই পায় না। কারণ আল্লাহ্ ভীরু মানুষকে সরাসরি ইসলাম বিরোধী কাজের আদেশ করলে কখনও মেনে নিবে না। সে জন্য শয়তান ইবাদতের নামে বিদ'আত কাজ করায়। বাস্তবিক আল্লাহভীরু মানুষকে যদি বলা হয়– চুরি কর ধনী হবে, তাহলে সে কখনও তা করবে না। আর যদি বলা হয় চাচা শবে বরাতে (১৫ই শা'বান) গোসল করলে প্রতি বিন্দুতে ১০টি করে নেকি এবং একশ' রাক'আত সালাত পড়লে জীবনের সব গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাহলে আর যায় কোথায়?

অশিক্ষিত আল্লাহ ভীরু চাচা একথা শ্রবণ করে ঠিক থাকতে না পেরে কোমরে কাপড় বেঁধে আমল শুরু করে দেবে। তাকে ঠেকানো মুশকিল। অথচ ঐ কাজগুলো বিদ'আত। আমল গৃহীত হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। এভাবে শয়তান

অনেকের আমল তিলে তিলে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং বিদ'আতের বিষাক্ত লাড্ডু খাওয়ায়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। তাদের মগজে একথা জাগে যে সৎ আমল বেশি-বেশি করব তাতে ক্ষতি কী? আর এ ধারণাই হচ্ছে নষ্ট গুড়ের খাজা। রান্নায় লবণ না দিলে স্বাদ হয় না ঠিক। তবে পরিমাণের সীমালঙ্ঘন করে ইচ্ছেমত লবণ দিলে স্বাদ হবে? কথায় বলে যত নুন তত স্বাদ হয় না। স্বাদের জন্য পরিমাণ মত লবণ দিতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাই।

ভাল কাজ বলে নিজের ইচ্ছায় যা মন চায় তাই করা যাবে না। রাসূল-এর নির্দেশিত পথ মুতাবিক কাজ করতে হবে। নেকির আশায় নবীজির পথ ব্যতীত নিজ মন মত কাজকে বিদ'আত বলা হয়। অনেকে ঐ কারণে বিদ'আতে পতিত হয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ ঐ ভুলে পতিত হতেন যদি রাসূল ﷺ তাদেরকে ধমক না দিতেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ اٰخَرُ : أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ اٰخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهٗ، لٰكِنِّىْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّىْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের বাড়ির দিকে আসেন। অত:পর তাদেরকে তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হলে অতি নগণ্য বা কম মনে করেন এবং বলেন, নবীজী কোথায় আর আমরা কোথায়? আল্লাহ তাঁর সামনে ও পেছনের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল, আমি

(প্রতিজ্ঞা করছি যে) রাতে সর্বক্ষণ সালাত পড়ব। দ্বিতীয়জন বলল; সব সময় রোযা রাখব, খাব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল : আমি মহিলা থেকে দূরে থাকব কখনো বিবাহ করব না। এরপর রাসূল ﷺ তাদের নিকট আসেন এবং বলেন, তোমরা কী এ কথা বলছ? সতর্ক হয়ে যাও, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি; কিন্তু আমি কখনো (নফল) রোযা রাখি আবার কখনো বর্জন করি। (রাত্রিতে) কখনো কখনো সালাত পড়ি, কখনো ঘুমাই এবং বিবাহ করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী : ৫০৬৩)

উক্ত তিন ব্যক্তি সৎ নিয়তে সালাত, রোযা এবং বিবাহ না করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বাহ্যিকভাবে তা অবশ্যই উত্তম কাজ; কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করে বিলম্ব না করে তাদের কাছে আসেন। এ জন্য যে, এটি এক মারাত্মক বিষয় যা রাসূল ﷺ-কে বিচলিত করে তোলে। অত:পর তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, আমার সুন্নাত থেকে যে ব্যক্তি বিমুখ হবে সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি চরম হুঁশিয়ারি বা সতর্ক বাণী। কারণ তাদের প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল সুন্নাত বিরোধী।

আর এটিই হচ্ছে বিদ'আত, যা ইবাদত গৃহীত হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। এ হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, মানুষের দৃষ্টিতে কাজ যতই বেশি অথবা সুন্দর হোক তা যদি সুন্নাতের বহির্ভূত হয় তাহলে তা মূল্যহীন। যেমন একটি বড় সুন্দর কাগজ আপনার নিকট পছন্দনীয়, সেটি দ্বারা দোকানে কোন দ্রব্য পাবেন না কেন? এ জন্য যে সেটি সরকারের অনুমোদিত নয়। পক্ষান্তরে ছোট, পুরাতন ময়লাযুক্ত একটি নোট দ্বারা দ্রব্য পাবেন, কেননা সেটি সরকারের অনুমোদিত। অনুরূপ শরিয়তের সব আমলে নবী করীম ﷺ-এর মোহর বা অনুমোদন চাই। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত আপনার আমার নযরে আমল যতই সুন্দর হোক তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।

কতিপয় বিদ'আতের নমুনা

১. মুখে নিয়ত উচ্চারণ : যেমন কিছু মানুষকে সালাত আরম্ভ করার সময় মুখে নিয়ত আওড়াতে শুনা যায়। অথচ নিয়তের স্থান হল অন্তর তাই মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

২. মিলাদ মাহফিল : আমাদের সমাজে ইসলামের কিছু বিধান বাস্তবায়িত না হলেও মিলাদ মাহফিল সকলের কাছে স্থান করে নিয়েছে। কোকিল যেমন কাকের

অগোচরে কাকের বাসা থেকে ডিম ফেলে দিয়ে নিজে ডিম পেড়ে দেয় এবং নকল আসলে আসল নকলে পরিণত হয় তা কেউ টের পায় না। তেমনি সুন্নাতের স্থানে বিদ'আত কখন স্থান করে নিয়েছে এ বিষয়ে অনেকে বেখবর। যেমন–

৩. জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন।
৪. বিবাহ বার্ষিকী।
৫. জামা'আতবদ্ধভাবে যিকির।
৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর জামা'আতসহকারে হাত তুলে দু'আ।
৭. দু'আর পর মুখে হস্তদ্বয় বুলানো।
৮. রাসূল ﷺ-এর নাম শ্রবণ করে চুমো খাওয়া।
৯. বিশেষ করে ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা।
১০. বড়দের পায়ে সালাম করা।
১১. পেশাব করার পর ঢিলা দ্বারা লজ্জাস্থানকে ধরে চল্লিশ কদম হাঁটা।
১২. তাবলীগের উদ্দেশ্যে চিল্লা দেয়া।
১৩. কবর বাঁধানো।
১৪. শা'বানের ১৫ তারিখ রোযা, রুটি-পিঠা অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা।
১৫. লা-ইলাহা বা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহু আল্লাহু বা হু হু যিকির করা।
১৬. ঘাড় মাসেহ করা।

বিদ'আতীদের সাথে চলা-ফেরা

বিদ'আতীদের সাথে চলা-ফেরা করলে তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মানুষ বিদ'আত কাজে পতিত হয়ে নিজ আমল নষ্ট করে জীবনের সবকিছু হারাবে, যেমন : আলুর গাদে একটি পচা আলু থাকলে বাকি আলুকে পচিয়ে দেয়। সে জন্য কোন কোন সালাফ তাদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ করেছেন। যেমন : হাসান বসরী (র) বলেন, যারা মনের পূজারি তাদের সাথে ভাব ভালোবাসা রেখো না নচেৎ তোমার অন্তরে বিদ'আত গেঁথে দিবে এবং তুমি তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। আর যদি বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে তুমি আন্তরিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে। (আল-বিদ'আত : ড. আলী বিন মুহাম্মদ আল ফাকিহী)

আবু কিলাবাহ বলেন : "মন পূজারিরা (বিদ'আতীরা) সরল পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, আমি জাহান্নাম ছাড়া তাদের ঠিকানা দেখছি না। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত চালু করে সে নিজের জন্য তালোয়ার বৈধ করে অর্থাৎ নিজেই হত্যার যোগ্য হয়ে যায়। (আল-ইতেসাম, আশশাতেবী)

আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন : বিদ'আতী যত বেশি বিদ'আতে নিমজ্জিত হয় তত সে আল্লাহ হতে দূরে সরে যায়। (আল-বিদ'আত : ড. আলী বিন মুহাম্মদ আল ফাকিহী)

ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর বলেন : রাস্তায় যখন তোমার কোন বিদ'আতীর সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন তুমি তোমার রাস্তা পরিবর্তন করে নিবে। (ঐ)

বিদ'আতীর তাওবা

কথায় বলে ইঁদুরের কপালে সিঁদুর মিলে না। অনুরূপ বিদ'আতীর ভাগ্যে হিদায়াত জুটবে না। ইয়াহইয়া ইবনে আবি ওমর শাইবানী বলেন, কথিত আছে যে, আল্লাহ বিদ'আতীকে হিদায়াতের তৌফিক দেন না। সে বিদ'আত থেকে বেরিয়ে আসে না; বরং যথাক্রমে বিদ'আতের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে।

এ জন্য আওয়াম ইবনে হওশাব নিজ ছেলেকে উপদেশ দিতেন যে, হে ঈসা তুমি আত্মা শুদ্ধ কর এবং নিজ সম্পদ কম কর। আরো বলতেন, আল্লাহর কসম আমি যদি ঈসাকে বিদ'আতীদের বৈঠকের পরিবর্তে অন্য কোনো অনুষ্ঠানে বসা দেখি তাহলে তুলনামূলকভাবে আনন্দিত হব।

তিনি এ ধরনের কথা এ জন্যই বলতেন যে বিদ'আতী বিদ'আত কাজকে দ্বীনি বিধান জ্ঞান করে সম্পাদন করে। যখনই একটি বিদ'আত বর্জন করে তখনি তার চেয়ে বড় বিদ'আতে লিপ্ত হয়। অন্যথায় ফাসেক ও পাপী, যেমন নাচ-গানকারী এবং মদ্যপায়ী মন্দ কাজ ভেবেই করে। এদের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে এমন সময় আসবে যে তারা তাদের অপকর্ম থেকে তাওবা করবে; কিন্তু বিদ'আতী বিদ'আত থেকে তাওবা করতে পারে না। কারণ সে বিদ'আতকে ইবাদত মনে করে।

বিদ'আতীর পরিণাম

যারা ইবাদত করে তাদের পরিণাম জাহান্নাম এটি স্পষ্ট বিষয়। তবে এক প্রকার মানুষ আমল করেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর তারা হচ্ছে বিদ'আতী। তাদের আমল বিদ'আত মুক্ত না হওয়ায় আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য। বিদ'আতীরা কিয়ামতের মাঠে রাসূল ﷺ-এর কাছেও যেতে পারবে না এবং হাউজে কাওসারে পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূল ﷺ-এর বাণী—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُ عَلَىَّ اُمَّتِى الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهٖ

قَالُوْا : يَانَبِيَّ اللّٰهِ ! اَتَعْرِفُنَا؟ ! قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمًا لَيْسَتْ لاَحَدٍ غَيْرِكُمْ، تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ، وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّىْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُوْنَ . فَاَقُوْلُ : يَا رَبِّ ! هٰؤُلاَءِ مِنْ اَصْحَابِىْ، فَيُجِيْبُنِىْ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ : وَهَلْ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟

অর্থ : বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: আমার উম্মত আমার নিকট হাউজের পানি পান করার জন্য উপস্থিত হবে আর আমি মানুষকে হাউজ হতে ঠিক ঐভাবে বিতাড়িত করব যেভাবে মানুষ নিজ উট হতে অন্য লোকের উটকে বিতাড়িত করে।

সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি তখন আমাদের চিনবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমাদের একটি নিদর্শন আছে যা তোমাদের ছাড়া অন্যদের নেই। সেটি হলো তোমরা ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকিত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হবে এবং তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না। তারা আমার নিকট আসতে পারবে না।

আমি তখন বলব, 'হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত?' অত:পর জনৈক ফেরেশতা আমাকে উত্তরে বলবেন, এরা আপনার মৃত্যুর পর যে নতুন কাজ আমদানি করেছিল আপনি তা জানেন? (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنِّىْ عَلَى الْحَوْضِ حَتّٰى اَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ اُنَاسٌ دُوْنِىْ، فَاَقُوْلُ : يَا رَبِّ ! مِنِّىْ وَمِنْ اُمَّتِىْ، فَيُقَالُ : اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ؟ وَاللّٰهِ ! مَا بَرِحُوْا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ .

অর্থ : আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'আমি সে দিন হাউজের পাশে থাকব, তোমাদের মধ্যে যে আমার কাছে আসবে তাকিয়ে দেখব, তার মধ্যে কিছু মানুষকে আটক করা হলে আমি বলব, হে আমার রব এরা তো আমার উম্মত?' তখন বলা হবে, আপনার মৃত্যুর পর এরা কী আমল করত আপনি জানেন? আল্লাহর কসম, আপনার মৃত্যুর পর (সুন্নাত) হতে বিমুখ হয়েছিল। (মুসলিম, হাদীস নং ২২৯৩)

এছাড়া আল্লাহ বিদ'আতীদের স্থান প্রদানকারীর ওপর অভিশাপ করেছেন। রাসূলের বাণী–

حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ : مَا هُنَّ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ : قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ -

অর্থ : আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেলাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালেব (রা)-এর নিকট বসেছিলাম। অত:পর তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে নবী করীম ﷺ কি আপনার নিকট কোন কিছু গোপন রেখেছেন?

বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) রাগান্বিত হন এবং বলেন, নবী করীম ﷺ লোকদের গোপন করে আমাকে কিছু বলেন নি, তবে তিনি আমাকে চারটি বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন : 'যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে, নিজ পিতা-মাতার ওপর অভিশাপ করে, বিদ'আতীকে স্থান দেয় এবং জমির সীমা রেখা স্তম্ভ বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' (মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৮)

এ হাদীস থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে বিদ'আতীকে স্থান দিলে যদি আল্লাহর অভিশাপের পাত্র হতে হয় তাহলে বিদ'আতী ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় অপরাধী? বিদ'আতীর ইবাদত আমল কবুলের শর্তের আওতাভুক্ত না হওয়ায় আখেরাতে তার অবস্থা হবে শোচনীয়।

সারকথা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হল তা হতে আমরা ইবাদত বা আমল কবুলের যে শর্ত তা মোটামুটি উপলব্ধি করলাম। আলোচনায় বলা হয়েছে আমল কবুলের দু'টি শর্ত।

১. ইখলাস অর্থাৎ তাওহীদভিত্তিক এবং শিরকমুক্ত আমল। শিরকমুক্ত বলতে আল্লাহর প্রভুত্ব ইবাদত এবং নাম ও গুণবাচক তাওহীদে যেন কোনরূপ শিরকের গন্ধ না থাকে।

২. মুতাবে'আত অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সহীহ সুন্নাত সম্মত আমল। এ শর্তদ্বয় ব্যতীত যতই ইবাদত কেউ করুক না কেন তার ইবাদত আল্লাহর সমীপে গৃহীত হবে না। সে জন্য শিরক ও বিদ'আতমুক্ত ইবাদত করা আমাদের সকলের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য।

সতর্কবাণী

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, সালাতে 'রাফউল ইয়াদাইন' অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার সময় ও তা থেকে মাথা উঠাবার সময় এবং দ্বিতীয় রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত। এটি না করলে কী সালাত হয় না?

উত্তর : সালাতে কয়েক রকম বিধান আছে।

রুকন (স্তম্ভ) : যা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ত্যাগ করলে সাহু সেজদায় পূরণ হয় না পুনরায় পড়তে হয়। যেমন : সূরা ফাতিহা পাঠ, রুকু ও সেজদা ইত্যাদি।

ওয়াজিব : যা ভুলবশত ছেড়ে দিলে সাহু সেজদা করতে হয়। যেমন : দ্বিতীয় রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ ও সেজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলা ইত্যাদি।

সুন্নাত : যেমন– 'রাফউল ইয়াদাইন' (হাত তোলা) এটি যদি বাদ পড়ে যায় অথবা ভুলে যায় তাহলে সাহু সেজদা ছাড়া সালাত হয়ে যাবে, সালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে কেউ যদি মনে করে যে, 'রাফউল ইয়াদাইন' সুন্নাত, না করলে সালাত হয়ে যায় তাহলে তা না করে সালাত পড়লে ক্ষতি কী? তাকে এ বলে সতর্ক করতে চাই যে কখনো কখনো 'রাফউল ইয়াদাইন' ছুটে যাওয়া ও সাহু সিজদাহ ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, 'রাফউল ইয়াদাইন' বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া। কারণ রাফউল ইয়াদায়েন ছাড়া সালাত শুদ্ধ হওয়া আর তা ছাড়তে অভ্যস্ত হওয়া এ দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়; কিন্তু সুন্নাত বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া রাসূলের হাদীসকে অস্বীকার করা হয়।

অতএব জেনে শুনে বরাবর সুন্নাত বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া ঈমান ও সালাত সন্দেহমুক্ত হওয়ার প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন : 'যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখছো সেভাবে সালাত পড়।' (বুখারী)

অবশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে তাওহীদ ও সুন্নাতভিত্তিক আমল করার তৌফিক দাও, যে কাজে তোমার নৈকট্য সাধিত হবে সে কাজ করার ক্ষমতা দান কর। যে পথে তোমার প্রিয়জন 'আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীন' চলে গেছেন সে পথের পথিক কর। যে পথে চললে তুমি সন্তুষ্ট সে পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে অনেকে শিরক-বিদ'আতের বিষাক্ত শরাব পানে মাতোয়ারা হয়ে মরীচিকার পিছনে ছুটছে, তাদেরকে তুমি জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে পরিচালিত কর। কুরআন, সহীহ্ হাদীস বুঝা ও মানার তাওফীক দাও। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অন্তর আলোকিত কর। নবী ও সাহাবীদের যুগে মুসলমানরা যেমন কেবল কুরআন-হাদীসের অনুসারী ছিল তেমনি আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসারী বানাও। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও এবং জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমিন!!

কেন দু'আ কবুল হয় না

শাকীকুল বলখী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইব্রাহিম বিন আদহাম একজন সু-প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তিনি একদিন বসরার বাজারে গেলে অনেক লোক তাঁকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করল, 'হো ইব্রাহিম ইবনে আদহাম' আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন, 'হে আমার বান্দারা তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব।' অথচ ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বললেন, হে বসরার অধিবাসী! তোমাদের অন্তর দশটি জিনিসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। যার দরুণ দু'আ কবুল হচ্ছে না। যথা–

عَرَفْتُمُ اللّٰهَ وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ ـ

১. তোমরা আল্লাহকে জান অথচ তার হক্ব পুরোপুরিভাবে আদায় কর না।

قَرَأْتُمُ الْقُرْاٰنَ وَلَمْ تَعْلَمُوْا بِهِ ـ

২. তোমরা কুরআন শরীফ পাঠ কর অথচ তার গুরুত্ব অনুধাবন কর না।

اِدَّعَيْتُمْ حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ ـ

৩. তোমরা রাসূল ﷺ-কে ভালবাস অথচ তার সুন্নাতকে ছেড়ে দাও।

اِدَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَاَطَعْتُمُوْهُ وَوَافَقْتُمُوْهُ ـ

৪. তোমরা শয়তানকে শত্রু হিসেবে জান অথচ তার পথই অনুসরণ করে চল।

اِدَّعَيْتُمْ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْمَلُوْا لَهَا ـ

৫. তোমরা জান্নাতে যেতে চাও অথচ জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমল কর না।

اِدَّعَيْتُمُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَرَمَيْتُمْ فِيْهَا اَنْفُسَكُمْ ـ

৬. তোমরা দোযখের আগুন হতে মুক্তি পেতে চাও অথচ তোমরা আগুনের মধ্যে রয়েছ।

قُلْتُمْ اَلْمَوْتُ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوْلَهٗ ـ

৭. তোমরা মৃত্যুকে সত্য বলে জান অথচ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না।

اِشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوْبِ اِخْوَانِكُمْ فَلاَ تَرَوْنَ عُيُوْبَ اَنْفُسِكُمْ ـ

৮. তোমরা তোমার ভাইয়ের দোষ প্রচার কর অথচ নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য কর না।

اَكَلْتُمْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوْا لَهٗ ـ

৯. তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, অথচ তার শোকরিয়া আদায় কর না।

دَفَنْتُمْ اَمْوَاتَكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوْا بِهِمْ ـ

১০. তোমরা মৃত মানুষকে দাফন কর অথচ তা থেকে মোটেই শিক্ষা গ্রহণ কর না।

সমাপ্ত

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩১.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৩২.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
৩৩.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
৩৪.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
৩৫.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
৩৬.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
৩৭.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩৮.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৯.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০
৪০.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৪১.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৪২.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৪৩.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪৪.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৪৫.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪৬.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
৪৭.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪৮.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৪৯.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৫০.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
৫১.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৫২.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৫৩.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৫৪.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৫৫.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫৬.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
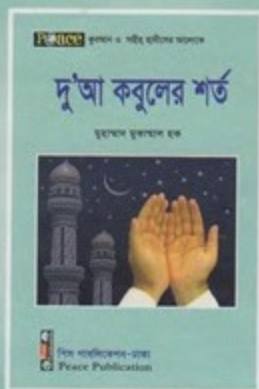
ISBN 978-984-8885-22-2
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com